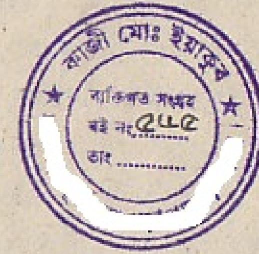
কাশ্মীর, তুমি কার?



কাশ্মীর, তুমি কার ?



ভবঘুরে

প্রভাতি প্রকাশনী

মীরপুর—১২, ঢাকা।

KASHMIR, TUMEE KAAR ?
by—'Bhabaghure'
Published by :
'SAIMUM' From
Mirpur, Sec.—12.
Dhaka.



প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর/৮৬।

মূল্য ঃ বিশ টাকা।

প্রকাশকের কথা

অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত এই বইটির মূল প্রকাশক ও লেখককে ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে হলো। তার কারণ, এ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থির, অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বিরাজ করছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের পটভূমি—যার প্রেক্ষিতে কে কখন 'নবাব সিরাজ' কে 'মীরজাফর' এবং কে-ই বা 'ঘাতক মীরণের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন—বলা মুস্কিল— বিশেষতঃ পর্দার নেপথ্যে যেখানে বিদেশী কালোহাত অত্যন্ত সক্রিয়। এমন পরিস্থিতিতে বিশেষ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থে আমাদেরকে বিরূপ-রূপে চিহ্নিত করতে পারেন—ইতিপূর্বে তারা তা করেছেন এবং করে থাকেন। তাই এই ছদ্মবেশ, যদিও তা সাময়িক সময়ের জন্য।

অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে আমরা রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু কিছুতেই রাজনীতিবিদ নই। যে কারণে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা শেখ মুজিবের জীবনের দুর্লভ অধ্যায়; ইন্দিরা রাজীব ও শিখ সম্প্রদায় নিয়েও নিরপেক্ষ পুস্তক রচনা করেছি—যা থেকে চক্ষুষ্মান পাঠক এই গোলার্ধের রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে সক্ষম হবেন। বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে এ বই রচিত হয়নি, তার প্রমাণ 'দি টেলিগ্রাফ', 'ডেইলী মেইল', 'নিউ ইয়োর্ক টাইমস্', 'লণ্ডন টাইমস্', 'উইকলী ইকনমিষ্ট', 'দি নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান'-এর বক্তব্য যা আমরা এখানে তুলে ধরেছি। জাতিসংঘের সনদ, পাক-ভারত কমিশন, পাক-ভারতের বিভিন্ন নেতৃবর্গের দুর্লভ ভাষণ, পত্র ও বক্তব্য দিয়ে বইটিকে তত্ত্ববহুল ও সুসজ্জিত করা হয়েছে। আশা করি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও এই নথি পত্র ও তথ্যাবলী বিশেষ উপকারে আসবে।

সাধারণ পাঠকদের কাশ্মীর সম্পর্কে কৌতুহল চরিতার্থ করাই এই বইটির আদি উদ্দেশ্য—যে জন্য শেখ আবদুল্লাহ্‌র 'ফ্লেমিং চিনার'-এর কিয়দংশও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে; ইতিমধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকেও যা একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। সার্বিকভাবে পত্র-পত্রিকার মতামতসমূহের সত্যাসত্য বিচারের দায়িত্ব তাদের হাতে, যারা আগামীতে এ সম্পর্কে ইতিহাস লিখবেন। বস্তুতঃ লেখক এখানে সংকলকমাত্র এবং প্রকাশক 'ইতিহাসের বাতিঘরে' আলোক-সঞ্চারী সহায়ক। ধন্যবাদ সবাইকে।

—সাইমুম।

সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

'ভূ-স্বর্গ' ও 'শেরে কাশ্মীরের' কথা

"Like something fationed in a dream & the iron man"

স্বর্গের বুকে প্রজ্জলিত নরক!

স্বর্গ শান্তিময়; কিন্তু সেই স্বর্গের বুকেই আজ অশান্তির আগুন লেগেছে; জ্বলছে জ্বালাময় এক নরক কুণ্ড। সারি সারি চিনার বৃক্ষের শ্যামল-হিল্লোলে দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে—চিনারের প্রতিটি শাখায় আজ বিস্তারিত তার লেলিহান অগ্নিশিখা! অথচ প্রকৃতি-প্রেমিক, শিল্প-রসিক, সৌন্দর্য-অন্বেষী সবাই জানেন, 'বিশ্বের কোথাও যদি স্বর্গধাম বলে কোন কিছু থেকে থাকে তবে তা এই কাশ্মীরেই।' কাশ্মীরের ঢেউ খেলানো পর্বত রাজি, অপরূপ অরণ্য শোভা, মনোরম মালভূমি আর মায়াময় মানুষগুলোর মুখ চেয়ে যারা এ দেশকে ভূ-স্বর্গ নামে আখ্যায়িত করেছেন—তারা অতিবড় ভুল করেছেন। তার কারণ, কোন দেশের স্বপ্নময় প্রাকৃতিক পরিবেশ আর সুবিস্তৃত উপত্যকায় বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে ধরে, সে দেশের সুখ-দুঃখের খতিয়ান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কাশ্মীরের বাহ্যিক রূপ শোভা অপরূপ বটে; কিন্তু তার অন্তরে রয়েছে এক জ্বলন্ত বিসুভিয়াস! সে এমন এক রূপসী কন্যার মত যার অঙ্গ ভরা রূপের আগুন, বুকে বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস আর মায়াবী চোখে বেদনার বারিধারা। তাই বলছিলাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচারে কাশ্মীর ভূ-খণ্ড ভূ-স্বর্গ বটে, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরলোকের অশান্তিতে কাশ্মীর এক জ্বালাময় নরক কুণ্ড।

'শেরে কাশ্মীর' ও 'আতশী চিনার'

একটি বাঘের বাচ্চার কথা বলছি—যে এই নয়নাভিরাম স্বর্গীয় কাননে একাকী ঘুরে বেড়াতো। যে এই বিস্ময়কর ঘন সবুজ ভূ-স্বর্গে

বসবাস করেও অহর্নিশ অশান্তির অনির্বান আগুনে জ্বলে পুরে মরতো। প্রাকৃতিক অফুরন্ত সৌন্দর্য সম্ভারের পানে তাকিয়ে সে ভাবতো, এ দেশবাসীর মনে কেন শান্তি নেই? ফুল ও ফসলের প্রাচুর্য তাকে পীড়া দিতো—কারণ, যারা তা ফলাচ্ছে তাদের উদর কেন শূন্য থাকবে? অদ্ভুত এক ভূ-প্রকৃতি রয়েছে কাশ্মীরে। বার মাসই চারটি ঋতু এখানে স্থায়ীভাবে বিরাজ করছে। কাশ্মীরের মাথায় শীত, কাঁধে বসন্ত, কোলে শরৎ, পায়ে চির গ্রীষ্মের দাবদাহ উত্তাপ। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের হাজারো উৎসুক দর্শক, ভ্রমণ-বিলাসী, সৌখিন আদমি প্রতিদিন এখানে আসছে। কেউ কেউ বা পাহাড়ের কোলে বাসা বেঁধে নিয়েছে—স্থায়ী প্রমোদ-ভবন; প্রায় সবই বাংলো টাইপের সাদা বাড়ী। ওরা কাশ্মীরের অত্যাশ্চর্য সাদা, সবুজ, নীল ও গাঢ় বেগুনী ঢেউ খেলানো পাহাড়গুলোর দিকে বাইনাকুলার বসায়—তাকিয়ে দেখে সেই অপরূপ শোভা…পর্বতচূড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বকের পালকের মত সাদা মেঘের খেলা—কোথাও বা পর্বত-শৃংঘে দুলছে সাতরঙা রঙ ধনুর হার।

ওরা ছুটে যায় ঝর্ণার ধারে, লেকের পাড়ে, মনোরম উপত্যকায়। ওরা দেখে, চঞ্চল মতি, উচ্ছল ঝর্ণা মেয়েরা কিভাবে দু'পায়ে নূপুর বাঁজিয়ে, কণ্ঠে বসন্তের সুর তুলে, সুদূর সমতটে শ্যামল-হিল্লোল তুলছে। কল্পনার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ওরা শোনে, গীরিখাঁদের মাঝে চঞ্চল ঝর্ণার কলতান—দু ধারে থাকে থাকে উঠে গেছে গীরিতট তারই মাঝে ধূসর সিল্কের মিহি আঁশের মত কুয়াশা ঝরছে রাতদিন। গোলাপী যৌবনাদের সঙ্গে নিয়ে ওরা এই নির্জন, নৈসর্গিক, ঐন্দ্রজালিক পরিবেশে আপন অস্তিত্বের খেই হারিয়ে ফেলে। কখনও কখনও ওদের চোখে পড়ে আখরোট, বাদাম আর আনারের ক্ষেতে একদল কিম্ভুত কিমাকার কালো। কালো কঙ্কালসার লোকের প্রতি, যারা ঘর্মাক্ত কলেবরে অক্লান্ত

পরিশ্রম করে চলেছে। অথবা ওরা দেখে—ভুট্টা, জব ও আঙ্গুর গাছে পানি দিচ্ছে এক শ্রেণীর কৃষাঙ্গী মেয়েরা। আবার জয়তুন গাছের পাশে নিত্য পানপাত্র হাতে, এইসব অনাচারী পুরুষেরা যখন উশৃংখল যুবতীদের কদর্য নাচে মত্ত হয়ে ওঠে; তখন অনাথ বালকের মতো যে সব ছেলেরা তাদের পানপাত্র এগিয়ে দেয়—তাদের পানে এরা ভ্রূ-কুঁচকে তাকায়। বিস্ময় আর কৌতুহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করে ওরা,

: তোমরা কারা?

বাচ্চাগুলো তখন ভয়ে জড় সড় হয়ে বলে,

: আমরা এখানকারই ছেলে—কাশ্মীরবাসী।

বিলাসী আদমীরা মুখ টিপে হাসে তখন।

০ ০ ০

বাঘের বাচ্চাটা রাতদিন ভাবে, কাশ্মীরের এই দুরাবস্থা কেন? যে দেশের মানুষ ভুবন-ভুলানো কাশ্মীরী গালিচা, কাশ্মীরী শাল তৈরী করছে—তারা কেন পাতার ঘরে মাটির ওপরে ঘুমোবে? তাদের দেহে কেন শতছিন্ন জীর্ণ বস্ত্র? বাঘের বাচ্চাটা তাকিয়ে দেখে, দ্রাক্ষা কুঞ্জে কি সুন্দর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর পর্দার মত ঝুলে আছে—কিন্তু সে আঙ্গুরে ওদের কোনো অধিকার নেই! কারবারের চাটাই বিছিয়ে রাখা হয়েছে সারা দেশটায়—গোটা কাশ্মীরই আজ বহিরাগত মুনাফালোটা মারোয়ারী মহাজনদের বিশাল গদিতে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ ও মধ্যভারতের অসংখ্য পুঁজিপতিরা এখানে এসে গরীব কাশ্মীরবাসীর রক্ত শোষণ করছে—চাঁদের আলোতে পাহাড়ের ওপরে বন-সুন্দরীদের নাচ দেখছে—মৌজ লুটছে!

বাঘের বাচ্চাটা অবাক হয়ে ভাবে, ভূ-স্বর্গে বসবাস করেও এ দেশবাসী কেন অমৃতের সন্ধান পাচ্ছে না? যারা নিজেদের দেশের মাটিতে রক্ত-ঘামে আঙ্গুর ফলিয়ে, তার রস চিপে অন্যের হাতের পানপাত্র ভরে দিচ্ছে - তাদের অদৃষ্টে কেন দু'টো শুকনো রুটিও জুটছে না? সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, এই সোনার দেশের অধিবাসী হয়েও কশ্মীরবাসীর পেটে নেই কেন ক্ষুধার অন্ন? নেই কেন মাথা গুঁজবার ঠাঁই? নেই কেন লজ্জা নিবারনের বস্ত্র?

দিনে দিনে দিন চলে যায়। বড় হতে থাকে বাঘের বাচ্চাটা। একদিন সবকিছুই তার চোখের সামনে জান্তব হয়ে ধরা দেয়। সে বুঝতে পারে—এশিয়ার পেটের মধ্যে, পাকিস্তানের মুখের মধ্যে, ভারতের রহস্যময় জটায় আবৃত এই দেশটি সত্যিই দুর্ভাগা দেশ নয়—এ দেশবাসীও সত্যিই হতভাগ্য নয়। প্রাকৃতিক লীলা বৈচিত্রে ভরপুর, স্বাস্থ্যকর অমীয় আবহাওয়ায় লালিত, নৈসর্গিক সুখানন্দে পরিপূর্ণ এই দেশটি সত্যিই বিশ্বের স্বর্গধাম। সামাজিক শোষণ, ধর্মীয় বৈসম্য ও রাজনৈতিক প্রতারণাই এই ভূ-স্বর্গের বুকে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়েছে; পররাজ্য লোলুপ তস্করের হিংস্র নখরের তলে কাশ্মীরের সুখ ও সৌভাগ্য ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত হয়েছে। তাদের বঞ্চনার অভিশাপে অভিশপ্ত কাশ্মীরবাসীর জীবন আজ সীমাহীন দারিদ্রতার অন্ধকারে দিশেহারা। অন্নহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় রোগে-শোকে ধুকে ধুকে মরছে 'ভূ-স্বর্গ' কাশ্মীরের সত্বাধিকারীগণ।

আগুন জ্বলে উঠলো তাঁর অন্তরে। বাঘের মতোই গর্জে উঠলেন তিনি। তাঁর সেই তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠের সঙ্গে একাত্ম হলো কাশ্মীরের সোয়া কোটি অনাহারী প্রবঞ্চিত মানুষ। সবাই এই ব্যাঘ্র-কণ্ঠের

অধিকারী 'শেখ আবদুল্লাহ'-র খেতাব দিল 'শেরে কাশ্মীর'। ভারত সরকারের এবার টনক নড়লো। শেরে কাশ্মীরকে জেলে পুরলো তারা। কিন্তু আগুন তাতে নিভলো না। জ্বলে উঠলো দাবানল। সারি সারি চিনার বৃক্ষের মাথায় ঝলসে উঠলো বিদ্রোহের বহ্নিশিখা। সেই অগ্নিশিখা মাথায় করে, গোটা কাশ্মীর ভূ-খণ্ডের চারধারে সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রইলো আতশী চিনার—কাশ্মীরের জাতীয় বৃক্ষ। শেখ আবদুল্লাহ্ অতীব সঙ্গোপনে কাশ্মীর বঞ্চনার ইতিহাস লিখে চললেন। বইটি ছিল 'জ্বলন্ত চিনার' বা 'আতশী চিনার' (দ্যা ফ্লেমিং চিনার)। ভারত সরকার নতুন টোপ ফেললো। শেখ আবদুল্লাহকে গদীতে বসানো হলো। কিন্তু তাতেই কি আতশী চিনার নিষ্প্রভ হয়ে গেল? থেমে গেল 'শেরে কাশ্মীরের' গর্জন?

দি টেলিগ্রাফ:

শেখ আবদুল্লাহর আদ্যপান্ত বলতে গেলে, অনেক কথা। শেখ আবদুল্লাহ আজ নেই—রয়ে গেছে তাঁর 'জ্বলন্ত আত্মজীবনী'—'দ্যা ফ্লেমিং চিনার'। 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার খবর থেকে জানা গেলো, শেরে কাশ্মীরের বিধবা স্ত্রী বেগম আকবর জাহান গত ১১ই এপ্রিল শ্রীনগর থেকে ঘোষণা করেছেন, শেরে কাশ্মীরের সেই আত্মজীবনীটি প্রকাশ করা হয়েছে।

কি লিখেছেন আবদুল্লাহ সেই ফ্লেমিং চিনারে? কেন এর নাম জ্বলন্ত চিনার? তবে কি গদিতে বসেও বুকের বিদগ্ধ আগুনে জ্বলছিলেন তিনি? নিজের ভেতরের সেই আগুনকেই কি তিনি চিনারের প্রতিটি পত্র-পল্লবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন? কি সেই আগুন যা ক্ষমতাসীন হয়েও শেখ

আবদুল্লাহ্‌কে আজীবন বুকের মাঝে চেপে রাখতে হয়েছিলো ? এ সব প্রসঙ্গ অবশ্য আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে অনেক দূরে ; তবু নিতান্তই কৌতুহল নিবারণার্থেই তার কিছু কিছু অংশ এখানে উল্লেখিত হলো।

'ইতিহাসের বাতিঘর' এবং কিছু রশ্মি

শেরে কাশ্মীরের 'আতশী চিনারকে' সম্ভবত আমরা 'ইতিহাসের বতিঘর' হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কেননা এতে শুধুমাত্র 'কাশ্মীর শার্দুলের' ব্যক্তিগত কথাবার্তাই নেই রয়েছে গোটা কাশ্মীরের রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি। তবে একটা কথা ঠিক, একজন রাজনীতিবিদ যতই নিরপেক্ষ সুরে কোনো দেশের কথা লিখুন না কেন, তিনি কিছুতেই নিজ রাজনৈতিক আদর্শের উর্দ্ধে কোনো বক্তব্য পেশ করতে পারেন না ; কারণ তাঁকে নিজের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎটা ভাবতেই হয়। তবু ভারত সরকরের গদীতে বসে শেখ আবদুল্লাহ্‌ যতটা যা বলেছেন, তা ইঙ্গিৎবাহী ও বিজ্ঞদের জন্য চিন্তনীয়। আতশী চিনারের শুরুতে তিনি লিখেছেন :

> "মহাত্মা গান্ধী যদি ফ্যানাটিক ঘাতকের গুলীতে নিহত না হতেন, তাহলে কাশ্মীরী জনগণ সত্যিকার অর্থে শাসিত কাশ্মীরের যে স্বপ্ন-ছবি দেখেছিল—তা হয়ত বাস্তবায়িত হতো ··· পাকিস্তানের সাথে আমাদের সম্পর্কটা আলাদা হলেও আরো মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ হতো।"

রাজনৈতিক কূটচক্রে পড়েই শেখ আবদুল্লাহ্‌কে একবার পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাতে হয়েছিলো এবং সে সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'আতশী চিনারে' বলেছেন :

> "হ্যাঁ, আমরা জিন্নাহ্‌ এবং পাকিস্তানের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। কেননা আমরা চেয়েছিলাম কাশ্মীরের যুগ যুগের পরাধীনতার গ্লানি মোচন করতে। পরবর্তীকালে একই ধরনের প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাতে হয়েছে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে—একই কারণে।"

উপরের দু'টি বক্তব্যেই এটা পরিষ্কার যে, কাশ্মীরের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের স্বপ্নে আবদুল্লাহ্‌ ভারত বা পাকিস্তান কাউকেই তোয়াজ করে কথা বলেন নি। কিন্তু কাশ্মীর কেন তার স্বাধীকার অর্জন করতে পারলো না ? তার উত্তর বোধকরি শেখ আবদুল্লাহ্‌র নিচের উক্তিতে স্পষ্ট হবে। 'আতশী চিনারের' একত্রে তিনি লিখেছেন :

> "Neheru and other Congress leaders bitrayed Kashmir."
> (অর্থাৎ নেহেরু এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ কাশ্মীরকে প্রবঞ্চণা করেছেন।)

'আতশী চিনারে'র অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন তিনি—

> "The independence movement in Jammu and Kashmir and its authentic forum, the national confference has never accepted the ditouchts of the Indian National Congress of the Muslim league because our quest has been for an independent identity and very special status for Kashmir."

ইতিহাসের এই বাতিঘর থেকে আমরা শেরে কাশ্মীরের চিন্তাদর্শের যে রশ্মি পাই—তাতে বলা যায়, তিনি তথা গোটা কাশ্মীরই স্বাধীকারের প্রশ্নে কখনো কারো সাথে আপোসে আসতে রাজী হয় নি। শীর দেবে,

তবু তারা আমানা দেবে না। স্বাধীকারের প্রশ্নে কাশ্মীর ইতিহাসের বুকে বহুবার শহীদি লহু ছিটিয়ে দিয়েছে—বহুবার তারা পরাধীনতার শেকল ছিঁড়তে চেয়েছে—কিন্তু পারেনি। কেন ?

এই ছোট্ট '.কেন'-র উত্তরই এই গোটা বই—'কাশ্মীর তুমি কার ?' সবচে মজার ব্যাপার হলো, কাশ্মীরের স্বাধীকারের প্রশ্ন তো দূরের কথা—ভারত ও পাকিস্তানের তাণ্ডব নৃত্য-ও নিজস্ব শ্লোগান দেখে শুনে মনে হচ্ছে, কাশ্মীর হয়তো ভারতের—নয়তো পাকিস্তানের। কাশ্মীর তুমি কার ? এই সহজ প্রশ্নটির জবাবও কিন্তু অতি সহজ—কাশ্মীর অবশ্যই কাশ্মীরবাসীর। তাই পরবর্তী প্রশ্ন আসে, 'কাশ্মীর তাহলে কেন স্বাধীকার পাচ্ছে না ?' এরই উত্তরে ইতিহাস ও দলিল ঘাটতে হয়। কিন্তু তারও আগে আমার মনে পড়ে যায় সেই 'দুই মাতাল ও এক যুবতী'র গল্পটা।

১

কাশ্মীর তুমি কার ?

এক চৌকশ যুবতীর উপমা ঃ

বহুকাল আগে, কোন এক মধ্যরাতে, রাজধানী শহর ঢাকার রাজপথে এমন এক নারী কেলেঙ্কারীর ঘটনা ঘটেছিল, যা কাশ্মীর-কেলেঙ্কারীর সঙ্গে তুলনীয়। নিশি-রাতের পথচারিগণ দেখতে পেলেন—এক যুবতী নারীর দু'টি হাত, দু'দিক থেকে দুই মাতাল টানছে। মাতালদ্বয়ের বক্তব্য—এই যুবতী তাদের বিবাহিতা স্ত্রী। দু'জন মানুষের একটি বউ ? এই তালগোল পাকানো ঘটনাটি স্থানীয়-ব্যক্তিদেরকেও কৌতুহলী করে তোলে। প্রথম মাতাল বলে,

: এ বউ আমার।

দ্বিতীয় মাতালের দাবী, মেয়েটি তারই বিবাহিতা স্ত্রী।

অনেক ঝগড়া, অনেক গণ্ডগোল, অনেক হাতাহাতির পর, মেয়েটিকে স্থানীয় ব্যক্তিরা আলাদা করে নিয়ে, প্রশ্ন করলো,

: ঠিক করে বলো, তুমি কার স্ত্রী ? তোমার স্বামী কে ?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন—যুবতী নারী তবু নিরুত্তর। শেষ-অব্দি জানা গেলো, এই যুবতী নারীটিও বোবা এবং কালা।

কাশ্মীর কম্পেক্সটির সঙ্গে এ ঘটনার মিল অনেক। কারণ পাকিস্তান বরাবরই বলছে, কাশ্মীর তার।

ভারত তো 'কুমীরের মুরগী গেলার মতো' কাশ্মীরকে গট্ করে গিলে বসে আছে। ভারতের এহেন কাণ্ড দেখে পাকিস্তান চেচামেচি শুরু

করলো—'পাকিস্তানের কাশ্মীরকে নাকি ভারত গ্রাস করেছে।' এ ব্যাপারে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত—১৮ বছরে পাকিস্তান 'জাতিসংঘ সামরিক পরিদর্শকের' কাছে ভারতের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ-বিরতি লঙ্ঘন' সম্পর্কিত প্রতিবাদ উথাপিত করেছে মোট পাঁচ হাজার ছ'শো তেষট্টিবার।

জাতিসংঘ সে ব্যাপারে কতোটুকু কি সমাধান দিতে পেরেছে, তা আমার মতো অর্বাচিনের জানা নেই। আমি শুধু এটুকুই জানি, শতকরা আশিজন মুসলমান অধ্যুষিত এই এলাকাটি না পারলো নিজেকে 'স্বতন্ত্র-স্বাধীন' একটি দেশ হিসেবে নিনাদ তুলে বিশ্বভূমে মস্তক উত্তলন করে দাঁড়াতে—না পারলো তার সগোত্রীয় দেশটির সঙ্গে প্রযুক্ত হতে। কিন্তু কেন?

কাশ্মীর কি সেই রাজপথে দেখা যুবতীর মতো কেবলই রূপ আর যৌবন সর্বস্ব শুধু? নিজের বাকশক্তি, স্বাধীকার ও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার শক্তি কি তার নেই?

ভারত বলছে,

: গণভোটের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, 'কাশ্মীর ভারতেরই অংশ এবং ভারতের সঙ্গেই থাকতে চায়।'

পাকিস্তান ভারতের দ্বারা কৃত এই গণভোটের 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলছে,

: এ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি।

তাদের মতে, কাশ্মীরে যে একদলীয় শাসন চলছিলো তাতে ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে মোট ৭২টি আসনের মধ্যে ৫৯টি আসনেই ন্যাশনাল কনফারেন্স বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিলো এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ৩৪টি আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয় নি।

তাহলে কিভাবে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভূত এলাকায় পরিণত হলো?

এ সম্পর্কে পাকিস্তান বলছে,

: ভারত, কাশ্মীরি মুসলমান নর-নারীকে নির্বিচারে হত্যা করেছে নিত্য নির্যাতন তাদের নৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়েছিলো। তারা মিথ্যেকে সত্য বলে সকল স্থানে প্রচার করে বেরিয়েছে; শক্তির বলে তারা সত্যকে গোপন করেছিলো এবং কারচুপির সাহায্যে স্বাধীকারের শাশ্বত নিয়মকেও লঙ্ঘন করেছিলো।

১৯৬৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর **"নিউ ইয়োর্ক টাইমস্"** পত্রিকা এ ব্যাপারে পাকিস্তানী বক্তব্যেরই সমর্থন জানিয়ে, একটি বিশেষ নিবন্ধও পেশ করেছিলো—যার শিরোনামটি ছিলো: "কাশ্মীরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ভারত কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করেছে।"

এ ব্যাপারে ভারতের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর বক্তব্যটি জানতে চাইলেন নিরপেক্ষ রাজনীতিজ্ঞরা। মিঃ শাস্ত্রী ঘরোয়াভাবে তাদেরকে জানালেন, তিনি তাঁর পূর্বসুরীর আরব্ধ কাজটি চূড়ান্তভাবে শেষ করেছেন। আর পার্লামেন্টে গিয়ে, নানাভাবে প্রশ্নবানে জর্জরিত হবার পর, মিঃ শাস্ত্রী তার পূর্বসুরী মিঃ জওহর লাল নেহেরুর চীৎকারের প্রতিধ্বনী তুলে বললেন,

: কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁর সরকার তজ্জন্য বাহ্যতঃ যা প্রয়োজন তাই করেছে!

ব্যাস—এটাই তাদের শেষ যুক্তি!

কিন্তু এ কথার সুরটা তো সেই জুলুমবাজ গ্রাম্য মোড়লের সুরের মতোই—যে লাঠির শক্তি ও কৌশলে স্বীয় অন্যায়কে ধামাচাপা দেবার জন্য চিৎকার করে এবং দাপট দেখায়। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যে বললেন, 'তাঁর সরকার কাশ্মীরকে অবিচ্ছেদ্য রাখতে বাহ্যতঃ যা প্রয়োজন তাই করেছেন'—এই 'বাহ্যতঃ প্রয়োজনীয়' পদক্ষেপটি কি ছিলো?

মাওলানা মাস্‌ঊদী শেখ এবং বেগ সাহেবের মতো নেতৃদ্বয়কে কারাগারে নিক্ষেপ করা? এবং কাশ্মীরের মুসলিম জনতার সংঘবদ্ধ সংগ্রামকে বানচাল করে দেবার জন্য কাশ্মীরের মুসলমান নরনারীকে নির্বিচারে গুলী করে হত্যা করা? ভারত সরকারের এই 'পদক্ষেপ' কতোটা মহান ও বাস্তবানুগ ছিলো, অথবা নৃশংস ও জঘন্যতম ছিলো; তার নজির পাওয়া যাবে ভারতনেত্রী মিস্ মৃদুলা সরাবাঈ-এর একটি উক্তি থেকে। মুসলমান নেতৃত্বকে কাশ্মীর থেকে চিরতরে বিলোপ করার জন্য ভারত সরকারের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মৃদুলা বাঈয়ের মতো হিন্দুস্থানী নেত্রীও বলতে বাধ্য হলেন, "এই বর্তমান পদক্ষেপ জনসাধারণকে তাদের উপযুক্ত নেতার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেছে··· তারা তাদের উপযুক্ত নেতার জন্য আইনগতভাবে সংগ্রাম করে আসছিলো। তারা কাশ্মীরের সকল সমস্যা সমাধান করতে যথাযথ ব্যবস্থা করছিলো, যাতে জনসাধারণের মধ্যে সহযোগীতার সৃষ্টি হয়—যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু···সর্বত্রই সশস্ত্র পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তারা জনসাধারণকে পাখীর মতো গুলী করে হত্যা করেছিলো"।

ভারত সরকার কেনো এই দুষ্কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করলো? তাদের দুর্বলতাটি কোথায়? তাহলে কি কাশ্মীরবাসী নিজেদের পাকিস্তানের অধিবাসী বলে মনে করে? তারা কি মনে করে, কাশ্মীর পাকিস্তানেরই অংশ এবং কাশ্মীর পাকিস্তানেরই হয়ে থাকবে? মূল বিরোধটা কোথায়? কোথা থেকে এবং কবে থেকে এই বিরোধের উৎপত্তি? কাশ্মীরকে কেন্দ্র করেই তো ভারত ও পাকিস্তানের বৈরিতা জমজমাট হয়ে বিরাজ করছে! আর এই বৈরিতার ফলশ্রুতি এই উপমহাদেশের অখণ্ড শান্তিকে বার বার বিঘ্নিত করেছে। আমরা আরো আগের কথা জানতে চাই—নিজেরাই বিচার বিবেচনা করে দেখতে চাই, কাশ্মীর আসলে কার? ভারতের, না, পাকিস্তানের?

২
কাশ্মীর সমস্যার অন্তরালে

যুগের ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেলেও আমরা দেখতে পাই এই কাশ্মীর ভূ-খণ্ডের অধিবাসিগণ কখনো নির্জলা সুখ-শান্তি উপভোগ করতে পারে নি। অতীতের অলি-গলি বেয়ে যতদুর দেখা যায়, তাতে এখানে আদি কালে এক শ্রেণীর নিম্ন হিন্দু গোষ্ঠী বসবাস করতো। কিন্তু তারা ছিল মুষ্টিমেয় গুটিকতক ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শ্রেণীর সেবাদাস মাত্র। পুরোহিত শ্রেণী ধর্মের দোহাই দিয়ে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এদেরকে শোষণ-শাসনের যাতাকলে ফেলে পিষে এসেছে—এদের রক্ত ও ঘামে নিজেদের আরাম-আয়েশের পরিধিকে কেবলই বিস্তৃত করেছে।

ইসলামের ঊষালগ্নে যখন মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ শোষণ-শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে, জীবন-মুক্তির দিশায় ব্যস্ত, তখন ইসলামের সোনালী রশ্মি এই চিনার বৃক্ষের দেশটিতেও আলোক-প্রভা বিস্তার করেছিলো।

কাশ্মীরবাসীর অন্তরে আনন্দের বান ডেকে গেলো। শতকরা আশিভাগ লোক যারা জীবন যন্ত্রনায় ধুকে ধুকে মরছিলো—তারা ইসলামের সাম্য-শান্তির পতাকাতলে এসে সমবেত হলো—মহা-জীবনের মহীয়ান অর্থ তারা খুঁজে পেলো। কিন্তু এতে সেই হিন্দু শোষক শ্রেণীর গাত্রদাহ উপস্থিত হলো। সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক অবধি—সুদীর্ঘ ছ'শো বছর হিন্দু রাজন্যবর্গ ছলে-বলে-কলে-কৌশলে এই আশিভাগ মুসলিম অধিবাসীকে পদানত করে রাখলো। এলো ১৩৪৯ সাল।

১৩৪৯ সালে প্রথমবারের মতো কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন এক মুসলিম শাসক—নাম তার শাহ্ মীর্জা। ইনি ১৩৪৯ সালেই 'শামস

উদ্দীন শাহ্' নাম ধারণ করে পাকাপাকিভাবে বসলেন কাশ্মীরী জনগণের হৃদয়ের মধ্যমণি হয়ে। 'পাকাপাকিভাবে' কথাটার অর্থ হলো—তাঁরই বিচক্ষণতায় তাঁর পাঁচ পুত্র পর পর মোট ৪৫ বছর কাশ্মীর শাসন করেছেন। এর পর শাসক বদলের পালা এলো—যাদের মাঝে সবচে প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেম জয়নুল আবেদিন।

মহৎ-প্রাণ জয়নুল আবেদিনকে পরবর্তীকালের বিদেশী ঐতিহাসিকগণ 'কাশ্মীরের আকবর' ('Akber of Kashmir') খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। তার কারণ, প্রজাগত-প্রাণ এই ব্যক্তিটির আমলেই কাশ্মীরবাসী সর্বোচ্চ সুখ-শান্তিময় জীবন যাপন করতে পেরেছিলো। জয়নুল আবেদিন তাঁর পূর্বসুরীদের আমলের মুদ্রামানের অবনতির প্রতিকার করেছিলেন। তিনি প্রজাদের করভার লাঘব করেছিলেন এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উদার নীতির ফলেই সিকান্দার শাহের আমলের বিতাড়িত কোন্দলপ্রিয় হিন্দু সম্প্রদায় পুনরায় কাশ্মীরে ফিরে আসতে পেরেছিলো এবং তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার পূর্ণ অধিকার দান করেছিলেন।

জয়নুল আবেদিন নিজেও বিদ্বান ছিলেন এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তারই আমলে 'মহাভারত' ও 'রাজতরঙ্গিণী' ফার্সী ভাষায় অনুদিত হয়। তিনি নিজে হিন্দী ফার্সী ও তিব্বতীয় ভাষা জানতেন এবং নিজ দরবারে বহু হিন্দু পণ্ডিতকেও স্থান দান করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—জয়নুল আবেদিন উত্তরাধিকারীগণের অযোগ্যতার কারণে কাশ্মীরের এই সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয় এবং হিন্দু আমত্যবর্গের উস্কানীতে রাজ্যে পুনরায় এক ভয়ানক অরাজকতা দেখা দেয় এবং এই অরাজকতার সুযোগে হায়দর মীর্জা নামে সম্রাট হুমায়ুনের এক আত্মীয়

কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করে নেন এবং ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে কাশ্মীর পুনরায় দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে চলে যায়।

এরপর ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে 'চক্র বংশের' চক্রান্তে মীর্জা বংশের পতন ঘটে এবং দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবর কাশ্মীরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন (১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এরপর বহুদিনের জন্য কাশ্মীরবাসীর ভাগ্য মোঘল সাম্রাজ্যধীনে চলে যায়। শেষ দিকে এলো বৃটিশ। এতে দেখা যায়—একমাত্র শাহ মীর্জা ও জয়নুল আবেদিনের আমল ছাড়া সর্বদাই কাশ্মীরবাসী পররাজ্য লোলুপ তস্করের হাতে ক্রীড়ানক হয়ে অশেষ ভোগান্তির জীবন কাটিয়েছে। সব শেষে এলো ১৯৪৭ সালের জুন মাস।

বৃটিশ সরকার, তার উত্তরাধিকারী ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে স্বীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসুন আমরা সেই সময় থেকে সূত্র খুঁজে দেখি। বৃটিশ সরকার কাশ্মীরকে কোন পাটে ফেললেন? ভারতের, না, পাকিস্তানের?

এর উত্তর হচ্ছে, কোনটাই না।

তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এই উপমহাদেশের ৫৬৫টি 'করদ রাজ্যের' ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছিলো। ইচ্ছে করেই কি বৃটিশ সরকার এই 'ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজ' পাক-ভারতের মাটিতে পুতে রেখে গিয়েছিলেন? নাকি তারা আসলেই সময় ও আগ্রহের সংক্ষেপতা হেতু এসবের ভার তাদের উত্তরসূরীদের হাতে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন?

"ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ অ্যাক্টে"-ই বা তারা কি বললেন? অ্যাক্টের অংশটি হুবহু দেখুন, যেখানে তেমন কিছুই বলা ছিলো না। শুধু বলা হয়েছিলো :

"নির্ধারিত দিনে (১৫ই আগস্ট, ১৯৪) ভারতীয় রাজ্যসমূহের উপর থেকে হিজ ম্যাজেষ্টীর কর্তৃত্ব লোপ পাবে, এবং এর সাথে সাথে এই অ্যাক্ট অনুমোদনের তারিখে চালু সকল সন্ধিপত্র ও চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে · ভারতীয় রাজ্যসমূহের প্রতি সেই তারিখে বলবৎ হিজ ম্যাজেষ্টির সকল দায়িত্ব, এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহে অথবা তাদের সম্পর্কে সেই তারিখে বলবৎ হিজ ম্যাজেষ্টি কর্তৃক প্রযোজ্য সকল ক্ষমতা, অধিকার, কর্তৃত্ব অথবা এক্তিয়ার এসব রাজ্যের শাসকদের উপর ন্যাস্ত হবে .. "

কাশ্মীর বা এই ৫৬৫টি করদ রাজ্যের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে সাতচল্লিশের সেই জুন মাসের অ্যাক্টে আর বেশীকিছু ছিলো না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, গোলমালটা সেই শুরু থেকেই রয়ে গেলো।

এর ক দিন পরে এই উপমহাদেশের সর্বশেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সরকারী সফরে পুনঃ ইংল্যাণ্ড পাড়ি দিয়ে ভারতে এলেন। তিনি এ সময় ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহান কিছু বাণী পেশ করলেন। সরকারী উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, তিনি স্থানীয় রাজাদেরকে একত্রিভূত করে, একটি ভাষণও দিলেন। সেই ভাষণের এক্ত্রে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বললেন,

: ভারতে অথবা পাকিস্তানে যোগদানের ক্ষেত্রে আপনারা নীতিগত-ভাবে স্বাধীন। তবে তা করতে গিয়ে, আপনারা যেনো ভৌগলিক বাধ্যবাধকতাকে এড়িয়ে না যান।

মাউন্ট ব্যাটেন আরো বলেছিলেন,

: আপনারা ডোমিনিয়ন সরকারের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারবেন না. কারণ ডোমিনিয়ন সরকার আপনাদের প্রতিবেশী —যেমন আপনারা সরে যেতে পারবেন না আপনাদের প্রজাদের কাছ থেকে, যাদের কল্যাণ-কর্ম আপনাদের মহান দায়িত্ব।

তাহলে, সাতচল্লিশের অ্যাক্ট এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কার্যকর ভাষণ থেকে এ সম্পর্কে সঠিকভাবে এই তিনটি সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে,

(ক) কাশ্মীরের রাজাকে ডোমিনিয়ন সরকারের সঙ্গে থাকতে হবে।

খ) রাজা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে, নাকি ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে—তার থেকেও বড় কথা ও বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে. প্রজারা কার সঙ্গে যুক্ত হতে চায়? পাকিস্তান, না ভারতের সঙ্গে? সেটাই বড়।

(গ) কোনো রাজ্যেরই, পাকিস্তান বা ভারতের ক্ষেত্রে যোগদানের ব্যাপারে পাকিস্তান ও ভারতের কোনো নিজস্ব ভূমিকা বা তৎপরতা থাকবে না। ভূমিকা থাকবে উক্ত রজ্যের জনগণের।

পাকিস্তান ও ভারতও প্রথম দিকে নিজেদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, উক্ত নীতিকে নিম্নোক্ত পন্থায় কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের যৌথ মতামতটি নিম্নরূপ:

"যেখানে একটি রাজ্যের শাসক তার রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ ছাড়া অন্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত, এবং রাজ্যটি এমন একটি ডোমিনিয়নে যোগদান করেনি যার সংখ্যা গরিষ্ঠ সমাজ এবং রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ অভিন্ন, সেখানে

রাজ্যটি চূড়ান্তভাবে কোন্ ডোমিনিয়নে যোগদান করবে তা নির্ধারিত হবে জনমত যাচাই-এর মাধ্যমে।"

এই নীতিমালার নিরিখে বিচার ও বিবেচনা করে, ৫৬৫টি করদ রাজ্যের মাঝে মাত্র তিনটির ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিলো; আর সে তিনটি রাজ্য হচ্ছে – (১) জুনাগড়, (২) হায়দ্রাবাদ ও (৩) কাশ্মীর। বলা বাহুল্য, এই তিনটি রাজ্যের মিমাংসায় গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল ভারত নিজেই।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েও আমরা সম্ভবতঃ জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করে নিতে পারি।

(১) জুনাগড়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ

বৃটিশ নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে, তথা আজাদী লাভের পর দেখা গেলো, জুনাগড়ের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানগণ একবাক্যে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদানের জন্য মিছিল সহকারে শ্লোগান তুলে যাচ্ছে। জুনাগড় তখোন মুসলিম নবাব দ্বারা শাসিত হচ্ছিলো এবং নবাব নিজেও জুনাগড়কে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছিলেন। জুনাগড়ের নবাব ও জনতার এই একাত্ম সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে, ভারত সরকার তখোন এই মর্মে ধুয়া তুললো যে, এই সিদ্ধান্ত পার্শ্ববর্তী কাথিওয়ার এলাকার অন্যান্য রাজ্যের প্রতি হুমকী স্বরূপ। অর্থাৎ জুনাগড়কে যদি মিলতেই হয়, তবে তাকে ভারতের সঙ্গে মিলতে হবে। এই অযৌক্তিক ও হাস্যকর মন্তব্য শুনে, জুনাগড়ের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ রীতিমত ক্ষেপে উঠে না। তারা, অর্থাৎ ভারত সরকার তখোন জুনাগড় রাজ্যের সীমান্তে ভারতীয় হিন্দু সৈন্য প্রেরণ করে এবং সেই সঙ্গে ট্যাঙ্ক, মারণাস্ত্র ও জঙ্গী বিমানের সাহায্যে সেই হিন্দু বাহিনীর শক্তিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

শুধু তাই নয়, ভারত সরকার জুনাগড় রাজ্যের ডাক, তার ও বিমান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পাকিস্তান কিন্তু যে কোনো রাজ্যের গণ-ভোট অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ও শর্তাবলী মেনে নিতে রাজী ছিলো। অথচ ভারত অন্যরূপ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সুযোগের জন্য ওৎ পেতে ছিলো সে এবং সহসা সে জুনাগড় রাজ্যের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে দখল করে নিলো। পাকিস্তান এ ব্যাপারে প্রথমে ভারতের কাছে এবং পরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রতিবাদ লিপি পাঠালো। আজো যে অভিযোগ জাতিসংঘের দপ্তরে বিচারাধীন রয়েছে। অথচ জুনাগড় চলে গেছে ভারতের কালো থাবার নীচে। এবারে আসুন, হায়দ্রাবাদের ইতিবৃত্ত আলোচনায়।

(২) হায়দ্রাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ

হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় থেকেও বড় একটি মুসলমান প্রধান রাজ্য—যার নরপতিও ছিলেন মুসলমান, নাম নিজাম। নিজাম তাঁর রাজ্যের জনগণকে নিয়ে, স্বাধীন ও সার্বভৌম হায়দ্রাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এ ব্যাপারে চাপ্ ও হুমকী দিলেন নিজামকে। নিজাম বাধ্য হলেন একটি 'স্থিতাবস্থা চুক্তিকে' মেনে নিতে। যে চুক্তির মাঝে হায়দ্রাবাদের নিজামের শর্ত ছিলো, "কিন্তু একজন স্বাধীন নরপতি হিসাবে আমার অধিকার সমূহের কোন প্রকার স্থায়ী ক্ষতি সাধন না করে।"

অথচ অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো, এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার দু'মাস পূর্বেই। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোনরূপ আলোচনা বা মুসলমানদের সম্মতি না নিয়েই ভারত সরকার তার সামরিক বাহিনীকে অতর্কিতে লেলিয়ে দিলো হায়দ্রাবাদের নরপতি

ও নীরিহ জনগণের ওপর এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যটিকে ভারতের সঙ্গে বলপূর্বক সংযুক্ত করে নিলো তারা। হায়দ্রাবাদ জাতিসংঘের কাছে প্রতিবাদ জানালো ; কিন্তু জাতিসংঘ এ অন্যায়ের কোনোরূপ প্রতিকার করেনি। আজও হায়দ্রাবাদ ভারতের পেটের মধ্যে দীর্ঘ দুঃখ-রজনী অতিবাহিত করে চলেছে।

(৩) কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ

হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড়ের থেকেও বহুগুণ বেশী অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হলো জম্মু ও কাশ্মীরের ওপর। কাশ্মীরের ওপর ভারত সরকার তার গায়ের জোরকেই আইন এবং গায়ের জোরের দখলকে 'আইনের দশদফা' বানিয়ে ফেললো। ভারতের এই অবৈধ লিপ্সাকে চরিতার্থ করতে, ষোলআনার স্থলে আঠারো আনা সাহায্য ও সহযোগীতা করলেন কাশ্মীরের তদানীন্তন হিন্দু মহারাজা। বিদায়ী বৃটিশ সরকারের সামনে তিনি এক ধরনের চাল চাল্লেন এবং বৃটিশ সরকার বিদায় নেবার পর, আরেক খেল্ শুরু করলেন তিনি।

জম্মু ও কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে কাশ্মীরের মহারাজা এক স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদন করলেন ; যে চুক্তিকে তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টে চূড়ান্তভাবে কার্যকর করা হবে বলেও ঘোষণা দিলেন। এই 'স্থিতাবস্থা চুক্তি-'তে মহারাজা এইমতো উল্লেখ করেছিলেন যে, "বিদায়ী বৃটিশ সরকার ও রাজ্যের মধ্যে যে সকল ব্যবস্থাবলী বিদ্যমান ছিলো সেগুলো কাশ্মীরের রাজ্য সরকার ও পাকিস্তানের সরকারের মধ্যে চালু থাকবে।"

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পেরিয়ে গেলো। দেখা গেলো, সে 'স্থিতাবস্থা চুক্তি' মোতাবেক কাশ্মীরের মহারাজা কোনোই পদক্ষেপ

নিচ্ছেন না। বুঝতে আর তখোন বাকি রইলো না যে, বিদায়ী বৃটিশ সরকারের সামনে এই হিন্দু মহারাজা যেটা করবেন বলে কাজে-কর্মে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, সেটা মূলতঃ একটা অভিনয় শুধু এবং অভিনেতা-মহারাজটির নেপথ্যে—কালো পর্দার আড়ালে ঢাকা অবস্থায় অন্য কোন নাট্য পরিচালক কাজ করছেন।

এ সম্পর্কে মহারাজাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জানালেন,

: আমি ভারতের সঙ্গেও অনুরূপ একটি চুক্তি সম্পাদনের কাজে ব্যাস্ত আছি।

গোঁজামিলটা এবারে পরিস্কার হয়ে গেলো। মহারাজা অন্য কারো সাথে জোট বেঁধে, কাশ্মীরের জনগণের মতামত ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কোনো কিছু করতে চান, যার জন্য কালক্ষেপ বা সময় অপচয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে তার 'স্থিতাবস্থা চুক্তি' বাস্তব-রূপ পরিগ্রহ করছে না। দূরদর্শী রাজনীতিকরা টের পেলেন, মহারাজা এমন কোনো একটি ঘোষণা দিতে চান, যা নিরপেক্ষ বিশ্বের নিকট 'অবৈধ' বলে বিবেচিত হবে এবং পাকিস্তানের নিকট বেঈমানীর সামীল হবে এবং যা কাশ্মীরের জনতার জন্য রীতিমত 'অপ্রিয়' হিসেবে প্রতিভাত হবে। তাই সেই গোপন সিদ্ধান্তের ঘোষণাকে যাতে কার্যকর করা যায় – সেজন্য গোপনে কাশ্মীরের মহারাজা একটি উপযুক্ত পরিবেশ ও ঘোষণার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাইছেন।

দূরদর্শী রাজনীতিকদের এ অনুমান মিথ্যে হলো না। মহারাজা অত্যন্ত গোপনে পার্শ্ববর্তী ভারতীয় এলাকা থেকে উগ্র 'মুসলিম বিরোধী' সংস্থা সমূহের লোকদেরকে দলে দলে এনে, কাশ্মীরে মোতায়েন করতে লাগালেন। পাকিস্তানের সঙ্গে তার এই 'স্থিতাবস্থা চুক্তিটা' ছিলো

নেহাতই একটা লোক দেখানো কর্মকাণ্ড যার দ্বারা তিনি কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের চোখেও ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা যে সকল উগ্রপন্থী সংস্থা সমূহকে গোপনে কাশ্মীরে এনে মোতায়েন করছিলেন তারা ছিলো যেমনি মুসলিম-বিরোধী, তেমনি উগ্র ও ভয়ঙ্কর। এ'দের মধ্যে ছিলো সেই কুখ্যাত আর-এস- এস. (RSS) বাহিনী—যাদের বাহ্যিক নাম ছিলো অতীব শ্রুতি-মধুর—'রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ'; অথচ এটি ছিলো কুখ্যাত 'ক্লু ক্লাক্স ক্ল'ন'-এর হিন্দু বিকল্প। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কাজটি এই সংস্থার সদস্যদের দ্বারা, 'হিন্দু মহাসভা' সমবিব্যাহারে সংঘটিত হয়েছিলো। বিদেশী জরীপের ফলাফলে জানা গেছে, মহারাজার আমদানীকৃত এ সকল স্বেচ্ছা সেবকদের সংখ্যা ২৫ লক্ষেরও বেশী ছিলো।

RSS বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো মহারাজার নিযুক্ত রাজ্যের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী এবং তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছিলো কতিপয় স্থানীয় হিন্দু পাণ্ডা। সবকিছু ঠিক্‌ঠাক। হিন্দু মহারাজা এবং তার মূল পরামর্শদাতার জঘণ্য ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখন শুধু এমন একটি 'কালরাত'-কে বেছে নিতে হবে, যেখান থেকে শুরু হবে কাশ্মীরের ঘুমন্ত মুসলমান নরনারীর ওপর অকথ্য নির্যাতন।

৩

ঘুমন্ত মুসলিম নর-নারীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ !!

কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা বহিঃশক্তির সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই আয়োজনটির কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবস (১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট) উত্তীর্ণ হবার অল্প কিছুদিন পরেই এই মুসলিম-বিরোধী 'ত্রি-শক্তি জোট' একযোগে কাশ্মীরের ঘুমন্ত, নিরীহ ও নিরস্ত্র মুসলিম নর-নারীর ওপর আক্রমণ চালালো। ওদের শয্যাভূমি রক্তাক্ত হলো এবং চির শয্যায় ঘুমিয়ে গেলো অগনন নর-নারী ও আবাল বৃদ্ধ বণিতা। স্বামীর পাশে গুলী বিদ্ধ মৃত স্ত্রী পড়ে আছে; মৃত স্বামীর রক্তাক্ত লাশ নিয়ে, হাহাকার করছে সদ্য বিধবা স্ত্রী! মায়ের বুক খালি করা দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য আহাজারি করছে বিলাপ বিধুর মাতা! বেয়োনেটবিদ্ধ সন্তানের মা-বাবা আর্তনাদ করতে করতে প্রাণ ভয়ে অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছে! এমনি কতো শত নৃশংস ও করুণ দৃশ্যের অবতারণা করা হলো মুসলিম অধ্যুসিত জন্নাত'র দেশ কাশ্মীরে- তা ভাষাতীত।

কাশ্মীরের মহারাজা ও পার্শ্ববর্তী হিন্দু প্রধানগণ একে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' নামে অভিহিত করতে চাইলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ক্ষতি হবার কথা – কিন্তু এ ক্ষতি তো একতরফা – কেবলমাত্র কাশ্মীরের নীরিহ মুসলমান নর-নারীর জান-মালের বিনাশ সাধন। হিন্দু মোড়লদের শতো প্রকার অপপ্রচারের ঢাক-ঢোল সত্ত্বেও, ছুটে এলেন 'লণ্ডন টাইমস্', 'ডেইলী মেইল' ও 'নিউ ইয়োর্ক টাইমস্' পত্রিকা সহ অগনন পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধিরা। তাদের রিপোর্টগুলো এবারে দেখা যাক :

[১] লণ্ডন টাইমস্ বলছে ঃ

" এইসব উগ্রপন্থীরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং রাজ্যের সৈন্য দের সহায়তায়; যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহারাজ, স্বয়ং, মুসলমান অধিবাসীদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করার অভিযান শুরু করেছিলো। ...... প্রথম ধাক্কাতেই প্রায় ২,৩৭,০০০ মুসলমানকে হয় ধারাবাহিকভাবে হত্যা করা হয়েছিলো অথবা সীমান্তের অপর পারে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো।"

কাশ্মীরের সবথেকে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ছিলো পুঞ্চ। এই পুঞ্চ সম্পর্কে আরেকটি আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন পত্রিকা কি বলছে দেখুন।

[২] ডেইলী মেইল বলছে ঃ

"... পুঞ্চের অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমান। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় তারা আনুপাতিকভাবে বেশী সৈন্য পাঠিয়ে, পাক-ভারতকে স্বাধীন করার কাজে সাহায্য করেছিলো বলে তাদের একটা আলাদা গৌরবও ছিলো। মাত্র ৫,০০,০০০ অধিবাসী থেকে তারা ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশী সৈন্য সরবরাহ করেছে এবং বেশী সম্মান-পদক লাভ করেছে ... তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা এই যোদ্ধাদের এলাকাকে ই দমন করার প্রয়োজন অনুভব করলো।"

[৩] নিউ ইয়র্ক টাইমস্ বলছে ঃ

'নিউ ইয়োর্ক টাইমস্' এর সুখ্যাত সংবাদদাতা রবার্ট ট্রামবুল জানিয়েছেন,

"জম্মুতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।"

[৪] শেখ আবদুল্লাহ্র বক্তব্য ঃ

প্রথমদিকে শেখ আবদুল্লাহ্ কাশ্মীরের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের হয়ে, গণতান্ত্রিক কথাবার্তা বলছিলেন। এ কারণে তিনি ভারত সরকারের কোপানলে পড়েছিলেন এবং ভারত সরকার তাঁকে নানান ছুঁতোয় কারা-অন্তরীণ করে। পরে কারাগারের মাঝে শেখ আবদুল্লাহ্ ও ভারতীয় কূটনৈতিকদের মাঝে গোপন শলাপরামর্শ চলে। তাঁকে একটি গোপন বিশেষ শর্তে ভারত সরকার কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। ঐ সময় তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে কাশ্মীরের মহারাজা এবং ভারত সরকারের প্ররোচনায় ও ছলনায় তাদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

ভারত সরকার ও কাশ্মীরের রাজার গোপন নির্দেশে একটি ভারতীয় পত্রিকা শেখ আবদুল্লাহ্র একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকারে শেখ আবদুল্লাহ্ কাশ্মীরের এই মুসলিম নর-নারীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত দায় সারা গোছের বক্তব্যটি পেশ করেন।

> "... কাশ্মীরের রাজ্য সরকার সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে এবং সেখানে ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়ে যায়। বয়স্ক জনগণের বেশীর ভাগকেই আমি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখেছি; তারা প্রায় সবাই-ই এককালে ভারতীয় বাহিনীর সৈনিক ছিলো। ঝিলাম ও রাওয়ালপিণ্ডির জনগণের সাথেও এদের একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তারা তাদের নারী ও শিশুদের সীমান্তের অপর পারে পাঠিয়ে দেয় এবং তারা ওখান থেকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ফিরে আসে......"

৪

কাশ্মীরের মহারাজার পলায়ন !

কাশ্মীরের রাজার, ঘুমন্ত মুসলিম নরনারীর ওপর এই অতর্কিত আক্রমণ ও নির্বিচার হত্যা, জম্মু, কাশ্মীর ও পুঞ্চ এলাকায় এক সন্ত্রাশের রাজত্ব সৃষ্টি করে। যারা নিহত হবার, তারা তা হয়েছিলো এবং বাকী জনগণ প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলো সীমান্তের অপর পারে। শরনার্থী কাশ্মীরবাসীর করুণ সে দুর্দশার কাহিনী সীমান্তপারের মানুষকে অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে। নিরীহ ও ঘুমন্ত মুসলিম নরনারীর ওপর এই আক্রমণ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকার উপজাতিদেরকে; যারা ইসলামের প্রতি তাদের অনুরাগ ও একনিষ্ঠ ভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলো।

অতর্কিত এই আক্রমণের পরও কাশ্মীরের মহারাজা নিশ্চুপ বসে রইলেন। তিনি তার কুখ্যাত ক্লু ক্লাক্স ক্লানের হিন্দু বিকল্প RSS বাহিনী ও কাশ্মীরের সৈন্যদের মাঝে 'মুসলিম খেদাও' নীতির বীজ বপন করলেন। স্থানীয় হিন্দু পাণ্ডাদের দ্বারা একটি গোপন নীলনক্সাও প্রস্তুত করলেন তিনি। স্থিরকৃত হলো, হিন্দু পাণ্ডাদের নির্দেশে রাজ্যবাহিনী ও RSS পরিচালিত হবে। এরপর মুসলিম প্রধান এক একটি স্থান বেছে নেয়া হলো এবং সেখানে অতর্কিত হামলা শুরু করে দেয়া হয়। যে সব বস্তি থেকে মুসলমানরা আগে ভাগেই প্রাণ বাঁচাবার জন্য সরে গিয়েছিলো; তাদের বস্তিতে লুটপাট অভিযান চালানো হতো এবং সর্বশেষে ঐ বস্তিকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করা হতো।

কাশ্মীর-মহারাজার সংঘবদ্ধ এই 'ত্রিজোট বাহিনীর' লোকেরা মাঠ-ঘাট থেকে মুসলমানদের গরু ছাগল, হাঁস-মুরগী ধরে নিয়ে যেতো এবং ফসল কাটিয়ে নিয়ে তা নিজেদের তত্বাবধানে স্থানীয় হিন্দুদের নিকট বিক্রী করতো। মহারাজার অত্যাচার যখোন দিনকে দিন এরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, তখোন আর নিরীহ, সংহারা, মুসলিম সম্প্রদায় চুপচাপ বসে রইলো না। তারা এই নির্বিচার নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গোষ্ঠি গড়ে তুললো। এই গণপ্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যরা তাদের শেষ সম্বল যা কিছু ছিলে ; তাই নিয়ে মহারাজার এই 'ত্রিজোট বাহিনীর' বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালানো শুরু করলো। মুসলমান-গণ জানতো, ধর্মীয় যুদ্ধে কোনো মুসলমান প্রাণ হারালে, সে শহীদ হবে এবং বাঁচলে সে গাজী হবে। ইসলামী মুহাব্বত ও জোশ তাদেরকে এতোখানি উদ্বুদ্ধ করেছিলো যে, তারা আধুনিক হাতিয়ার ছাড়াই প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু করলো উক্ত 'ত্রিজোট শক্তির' অত্যাচারের বিরুদ্ধে। স্বদেশ ও স্বজন হারানো মুসলমান শরনার্থীগণও তাদের সঙ্গে এসে যুক্ত হতে লাগলো। শেষ অবধি অবস্থা এমনই দাঁড়ালো যে, প্রতিরোধ বাহিনীর সামনে মহারাজার এই অত্যাচারী ত্রিজোটবাহিনী ছত্র ভঙ্গ হয়ে এদিকে ওদিকে পালাতে শুরু করলো।

প্রতিরোধ বাহিনী বলতে কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমস্ত মুসলমানদের-কেই বোঝায়। তারা মূল অশান্তির গোড়া মহারাজার স্বরূপটা চিনতে পারলো এবং তারা কাশ্মীরের মহারাজার ওপর অনাস্থা আনলো। তথাপি যখোন মহারাজা তার এই কু-মতলব ত্যাগ করলেন না; তখোন ধোঁয়ায়িত গণ-অসন্তোষ মহারাজার বিরুদ্ধে তীব্রতর আকার ধারণ করলো। বিপদ বুঝে মহারাজা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে জম্মুতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

৫

আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠন

মহারাজা পালিয়ে গেলেও, তিনি তার ত্রিজোট বাহিনীকে নতুন করে উদ্যোমী করে গিয়েছিলেন এবং এদেরকে রসদও জুগিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে নতুন উদ্যমে সংঘর্ষ শুরু হলো। সেপ্টেম্বর পেরিয়ে গেলো এবং অক্টোবরের মাঝামাঝিতে এসে এই সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করলো। মুসলমানগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করে ২৩ শে অক্টোবরের মধ্যে কাশ্মীরের অধিকাংশ স্থানকে মুক্ত করে ফেললো এবং এই মুক্তাঞ্চলে তারা 'আজাদ কাশ্মীর সরকার' গঠন করলো।

সংঘর্ষের দিনগুলোতে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের রাজ্য সরকারের মাঝে কিছু বাণী বিনিময় হয়। মুসলিম-প্রধান পাকিস্তান সরকার, কাশ্মীরের মুসলমানদের ওপর এহেনো অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, কাশ্মীরের রাজ্য সরকারকে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছিলো। সে চিঠিতে, কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বের সমস্ত শর্তগুলোকে নেহাতই মহারাজার 'ছলনা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কাশ্মীরের মহারাজা এ কথাকে এড়িয়ে গিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যে এক অভিযোগ আনায়ন করেন। মহারাজা উক্ত অভিযোগে বলেন, পাকিস্তান চক্রান্ত করে, তার রাজ্যের মাঝে হামলা চালিয়ে, তার রাজ্যের শান্তিকে বিনষ্ট করেছে। এবং এর জন্য মহারাজা কাশ্মীরের মাঝে একটি তদন্ত অনুষ্ঠানেরও দাবী জানান।

পাকিস্তান সঙ্গে সঙ্গে মহারাজার এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো। রাজ্য-সরকার অর্থাৎ কাশ্মীরের মহারাজা দেখলেন, কাশ্মীরে নিরপেক্ষ তদন্ত চাললে, তার সমস্ত জারিজুরিই ফাঁস হয়ে যাবে; ফলে তিনি বিপাকে পড়লেন, কিন্তু নিজের দেয়া প্রস্তাব নিজেই 'উইথড্র' করেন কি করে? ফলে তিনি বাধ্য হলেন নিরপেক্ষ তদন্তের কাজকে মুলতবি রাখতে।

৬

কাশ্মীরের মহারাজা, কায়েদে আজম ও ভারত সরকার

১৯৪৭ সালের ১৫ই অক্টোবরের কথা। কাশ্মীর রাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী মেহের চান্দ মহাজন তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজমের নিকট এক কড়া তারবার্তা প্রেরণ করেন। মূলতঃ তারা সর্বদাই পার্শ্ববর্তী ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের প্লান এঁটে চলেছিলো! এবং তাদের এ কাজগুলো ছিলো, সেই গুপ্ত পরিকল্পনারই বহিঃপ্রকাশ। যাহোক, তো কায়েদে আজমকে প্রেরীত এই তারবার্তায় মেহের চান্দ মহাজন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপন করে জানান, পাকিস্তান যদি কাশ্মীরে তার এইমতো ভূমিকা অব্যাহত রাখে, তাহলে কাশ্মীর সরকার বাধ্য হবে 'বাইরের সাহায্য' নিতে।

বলা বাহুল্য, এই 'বাইরের সাহায্য' বলতে মেহের চান্দ 'ভারতের সৈন্যবাহিনীকে' কাশ্মীরে আনিয়ে, কাশ্মীরের মুসলিম অধিকারকে বিনাশ করারই ফিকির করছিলো। কায়েদে আজম মেহের চান্দের এই অভিযোগ খণ্ডন করে, কাশ্মীরে এক পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি কাশ্মীরে ক্রমাগত মুসলিম নিধন যজ্ঞের প্রতিও কাশ্মীর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজনীয়তারও পুনোরুল্লেখ করেন। কায়েদে আজম মহারাজাকে অন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেন, "মহারাজা যদি তাঁর পূর্বের প্রতিশ্রুতি পালন করতে অভিলাষী হয়ে থাকেন; তাহলে পাকিস্তান তাঁর প্রতিশ্রুতি

পালনের ব্যাপারে সর্বাত্মক সাহায্য করবে এবং এ জন্য রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মহারাজা বা প্রধানমন্ত্রী এ পত্রের কোনোরূপ জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এরপর পাকিস্তান, কাশ্মীরের মুসলিম দলন-নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে, একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীকে কাশ্মীর সরকারের নিকট পাঠায়। তিনি কাশ্মীরের মহারাজার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহারাজা তাকে সাক্ষাৎদানেরও অনুমতি দেননি। বরং উল্টো তিনি ভারত সরকারকে একটি তারবার্তা প্রেরণ করলেন, যাতে লেখা ছিলো :

> "আমরা কাশ্মীরের সরকার ও জনগণ, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উৎপাতে ও অত্যাচারে এক বীভৎস জীবন যাপন করছি। পার্শ্ববর্তী দরদী রাষ্ট্র হিসেবে আমরা সরকারীভাবে ভারত সরকারের সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর এই তারবার্তা ভারত সরকারের হাতে পৌঁছানো হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা কমিটি সঙ্গে সঙ্গে একটি জরুরী বৈঠক তলব করেন। আসলে ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ সাজানো-গুছানো একটি নাটকের মতো। কাশ্মীরের সংখ্যাগুরু বীর মুসলমানদের ওপর কাশ্মীর সরকারের এই 'ত্রিজোট বাহিনীর' শক্তি এঁটে উঠতে পারছিলো না বলে ভারতের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আগে ভাগেই পেয়েছিলেন কাশ্মীরের মহারাজা।

যাই হোক, ভারতের প্রতিরক্ষা কমিটি তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলো যে, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচে জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে, কাশ্মীরে তড়িৎ গতিতে অস্ত্র শস্ত্র প্রেরণ করা।' প্রতিরক্ষা কমিটির এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারতীয় পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদেরকে নির্দেশ দেয়া

হলো', "তারা যেনো অতি সত্বর সড়ক, নদী ও আকাশ পথে কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করে এবং কাশ্মীরের মহারাজার হুকুম মোতাবেক কাজ করে।"

একই সঙ্গে ভারত-সরকার, ভারতের ষ্টেটস্ সেক্রেটারী ভি· ভি· মেননকে কাশ্মীরে পাঠানো হলো। তার ওপর নির্দেশ ছিলো সে যেনো কাশ্মীরের মহারাজার নিকট থেকে কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির দলিলটাও আদায় করে নিয়ে আসে। ভি· ভি· মেনন মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, মহারাজ কর্তৃক স্বাক্ষরিত দলিল নিয়ে পরের দিনই সে ভারতে ফিরে আসে ভারতের পক্ষ থেকে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এই অন্তর্ভুক্তি গ্রহণ করেন। এর পরই শুরু হয়ে যায় ভারতের সৈন্য কাশ্মীরে প্রেরণ।

কাশ্মীরকে সাময়িকভাবে সাহায্য করার জন্য যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরের এখানে ওখানে ঘাঁটি করলো—তারা আর কাশ্মীর থেকে ভারতে ফেরৎ এলো না। কাশ্মীরের জনগণ দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরও দেখলো, ভারতীয় সৈন্যরা ঘাঁটি থেকে আর ফিরছে না; বরং এখানে ওখানে আরো অগনন ঘাঁটি স্থাপন করা হচ্ছে; পুরোনো অস্থায়ী ঘাঁটিগুলোকে নতুন করে সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থায়ী করা হচ্ছে। তখোন তাদের মনে প্রশ্ন এলো,

: তাহলে কি কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অধিনেই চলে গেলো? কিন্তু কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা তো তা চায় না।

কাশ্মীরের এখানে ওখানে মুসলিম নাগরিকরা বিদ্রোহ করতে লাগলো। কিন্তু এ বিদ্রোহের ফলাফল অত্যন্ত করুণ ও ভয়াবহ রূপ নিলো। ভারতীয় সামরিক বাহিনী কঠোর হস্তে তাদের টুটি টিপে ধরতে লাগলো; নতুন

করে জেগে ওঠা RSS সদস্যরা বিদ্রোহী মুসলিম নেতাদের গুম্ করে ফেলতে লাগলো। নানান ছুঁতো ধরে, তাদেরকে বন্দী করা হলো এবং জেলে নিক্ষেপ করা হতো।

পাকিস্তান মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলো যে, ভারত গুপ্তলিপ্সা এবারে চরিতার্থ করে ফেলেছে। কিন্তু কাশ্মীর তো ভারতের নয়, কাশ্মীর পাকিস্তানের। পক্ষান্তরে, ভারতের বক্তব্য হচ্ছে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের উভয়ের বক্তব্যকে পূর্ণবার ভৌগলিক, নৃতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করে দেখার দরকার আছে।

৭

কাশ্মীর তুমি কার ঃ বিবিধ বিষয় বিশ্লেষণ

পাকিস্তান বলে, কাশ্মীর পাকিস্তানের।
ভারত বলে, কাশ্মীর তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মূলতঃ কাশ্মীর কার ? এ সত্যকে উদ্ঘাটনের জন্য আমরা এতোক্ষন কাশ্মীর সমস্যার অন্তরালের কাহিনী এবং সে সমস্যা সৃষ্টিতে কার কি ভূমিকা ছিলো ; তা নিয়ে আলোচনা করেছি। কাশ্মীর তুমি কার—সে ব্যাপারে এবার আমরা বিবিধ বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখবো। ভারতের কথা, পাকিস্তানের কথা, কাশ্মীরের জনতার কথা আমরা শুনেছি ; এবার আমরা প্রকৃতির কথা শুনবো। কাশ্মীরের অবস্থানটা কোথায় ? অবস্থানগত বিচারে এবং ভূ-প্রকৃতি অনুসারে, কাশ্মীর কার অংশে পড়ে ?

ভারত যে বলে, কাশ্মীর তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ ; কিন্তু সত্যিকারের অবস্থানগত বিচারে, কাশ্মীর তিনদিক দিয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে সংলগ্ন। ভারতের সঙ্গে তার সংলগ্নতা মাত্র ত্রিশ মাইল দীর্ঘ একটি ক্ষুদ্র এলাকা। তাও সেটা হবার নেপথ্য কারণ হচ্ছে, দেশ বিভাগ পরিকল্পনাকে সন্দেহ—জনকভাবে পাল্টে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গুরুদাসপুর জেলাকে ভারতের অংশে ফেলে দেয়া, যেটা ভারত জোর করেই করেছে।

হিমালয়ের বাধাকে অতিক্রম করে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখী সর্বঋতু-সড়কগুলি পাকিস্তানেরই ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে জম্মুর সমতল ভূমিটা স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তানেরই বিস্তৃতি।

পাকিস্তানের অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সব ক'টা নদীর উৎস এলাকাই এই কাশ্মীর রাজ্যে অবস্থিত। পাকিস্তানের চারপাশে এমন সব শক্তি রয়েছে যারা সব সময়ই পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন নয়; তাই অবস্থানগতভাবে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম কোনে অবস্থিত কাশ্মীর দেশটি পাকিস্তানের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এই রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ অধিবাসী মুসলমান। দেশ বিভাগের প্রধানতম নীতি অনুসারেই এটি পাকিস্তানের অংশ হওয়া উচিত ছিলো। যে কোনো একজন মানুষই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যাচাই করে দেখলে, দেখতে পাবে যে, এদেশবাসী একটি হিন্দু প্রধান দেশের সঙ্গে যুক্ত হবার বদলে একটি মুসলিম প্রধান দেশের সঙ্গেই যুক্ত হতে চাইবে।

এসব ব্যাপারে ভারতের কি বক্তব্য, সেটাও এবারে আলোচনা করা যাক এবং দেখা যাক ভারতের যুক্তিগুলোও কতোটা গ্রহণযোগ্য?

ভারত কাশ্মীরকে নিজের বাটে ফেলেছে নিম্নোক্ত পাঁচটি কারণে:

প্রথমতঃ যেহেতু ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের মহারাজা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে যোগদান করেন।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু, দুটি ঘটনার মাধ্যমে কাশ্মীরের জনসাধারনের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে—(১) এই রাজ্যে দু'টি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং (২) রাজ্যের "বিধান পরিষদ" কর্তৃক গৃহীত একত্রিকরণ প্রস্তাবের দ্বারা।

তৃতীয়তঃ যেহেতু, গণভোট কাশ্মীরে আর বৈধ হতে পারেনা, যেমন হতে পারেনা বোম্বাই, বেন্যারস কিংবা ভারতের অপর কোনো স্থানে।

চতুর্থতঃ যেহেতু, যে কোনো গণভোটই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত করবে।

পঞ্চমতঃ ভারত কখনো দ্বি-জাতি মতবাদ মেনে নেয়নি; এবং ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর ভারতের লৌকিকতারই নিদর্শন। (ভারতের প্রচারিত মতে)

ভারতের এ সকল সিদ্ধান্ত কতটা বৈধ? এবার সেটা বিচার করে দেখা যাক।

প্রথমতঃ কাশ্মীরের মহারাজা যখোন কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেন, সে সময়ে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মধ্যে একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি' বিদ্যমান ছিলো। যার ফলে, এক তরফাভাবে এই প্রস্তাব দেয়া এবং সেই প্রস্তাব অনুসারে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করাটা সম্পূর্ণই আইন বিরুদ্ধ ও অবৈধ কাজ হিসাবে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাব করার সময় মহারাজা নিজেই পালিয়ে যাচ্ছিলেন – দেশবাসী তার ওপর অনাস্থা এনেছিলো; শুধু তাই নয়, কাশ্মীরের বিরাট একটি অংশ থেকে মহারাজার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছিলো।

তৃতীয়তঃ এই 'অন্তর্ভুক্তি' প্রকাশ্যভাবেই কাশ্মীরের জনসাধারনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিলো এবং আজো তা রয়েছে।

চতুর্থতঃ কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী, উভয়েই ঘোষণা করেছিলেন যে, "এই অন্তর্ভুক্তি সাময়িক হবে।" অথচ আইনের ক্ষেত্রে সাময়িক অন্তর্ভুক্তির কোনো ব্যবস্থা নেই।

পঞ্চমতঃ এই অন্তর্ভুক্তিকে সাময়িক বলে ঘোষণা করার সময়

গভর্ণর জেনারেল এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী ও অপরাপর ভারতীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে রাজ্যের জনসাধারণ নিজেরাই।

সাধারণ নির্বাচন ও বিধান পরিষদের কার্যক্রম কতোটা সঠিক ছিলো ঃ

সাধারণ নির্বাচনসমূহে এবং বিধান পরিষদের কার্যক্রমে কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি। তার কারণ—

(১) অন্তর্ভুক্তির কারণে নির্বাচন করা হবে না—এ যুক্তি ধোপে টেকে না।

(২) তবু যে নির্বাচন করা হয়েছে, সব রকম বিশ্বস্ত সূত্র অনুসারে সে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় নি। কারণ, কাশ্মীরে তখোন একদলীয় শাসন চলছিলো। এবং ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে মোট ৭২টি আসনের মধ্যে ৫৯টি আসনে ন্যাশনাল কনফারেন্স বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাভ করে। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ৩৪টি আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয় নি।

(৩) কাশ্মীরের রাজনৈতিক জীবনে ভারত সরকারের নির্যাতন একটা দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছিলো। শেখ আবদুল্লাহ্‌কে বিশেষ উদ্দেশ্যেই বন্দী করা হলো এবং অতঃপর বাকী সদস্যবর্গকে ঘুষ ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা বাধ্য করার পরই রাজ্যের 'বিধান পরিষদ' অন্তর্ভুক্তি প্রস্তাবটি অনুমোদন করে।

এ ছাড়াও অন্যান্য বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে—

(ক) কাশ্মীরকে ভারতের অপরাপর অংশ (যেমন বোম্বে, বেনারস ইত্যাদি)-এর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এর সহজ বিচার হচ্ছে, দেশ বিভাগের পরিকল্পনায় স্বীকার করে নেয়া হয়েছিলো যে, 'ব্রিটিশ ভারত' বলে কথিত এলাকাকে মুসলিম ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত করা হবে। সুতরাং বোম্বে, বেনারস বা অপরাপর এলাকায় গণভোট হবে না বলে যে কাশ্মীরে গণভোট হবে না ; এ প্রশ্ন অবান্তর। বোম্বে, বেনারস হিন্দু প্রধান অঞ্চল—এ ধ্রুব সত্যটা তো পাকিস্তান বা কাশ্মীরবাসীরাও স্বীকার করে এবং তাই তারা ওসব অঞ্চলের গণভোট দাবী করে না। কাশ্মীর ও পাকিস্তান কেবলমাত্র কাশ্মীরের গণভোট দাবী করেছিলো—যেহেতু এখানকার অধিবাসীগণ প্রায় সবাই-ই-মুসলমান। ভারত বোম্বে ও বেনারসের ধূঁয়া তুলে, একটি সূর্যের মতো সত্যিকে ধামাচাপা দিতে চাচ্ছে।

(খ) করদরাজ্য বাদে অন্য কোথাও গণভোটের কথা ছিলো না। কারণ, করদরাজ্য সমূহেরই ভাগ্য অনির্ধারিত অবস্থায় রাজনৈতিক সূক্ষ্ম সুতোর ওপরে ঝুলছিলো। চুক্তি মোতাবেক করদরাজ্য হিসেবে কাশ্মীরে গণভোট না হওয়াটাই বেআইনী কথা।

(৪) ভারত দ্বিজাতি থিওরী মেনে নিক বা না নিক, তাতে পাকিস্তান বা কাশ্মীরের কিছু যায় আসে না ; কারণ, এটা ভারতের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বা তথ্যগত ব্যাপার ; তবে ভারত যে দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলো এবং সেই সঙ্গে সে কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য নীতিগতভাবে এবং আইনগত-ভাবে দায়বদ্ধ হয়েছিলো ; তা তো লিপিবদ্ধ দলিল হয়ে আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত এ ব্যাপারে বার বার প্রতিশ্রুতিও করেছে। ভারতের যারা এ ব্যাপারে নীতি ও আদর্শবাহী চিন্তাধারার বাহক তারাও বলেন, ভারত সরকার কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন ; তারা পাকিস্তানকে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে খামোখা গড়িমসি করছেন।

(৫) ভারতীয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ পর্যন্ত একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "ভারত সরকারের লৌকিকতা ও গণতন্ত্রের একটা ব্যাপকতর প্রদর্শন হবে কাশ্মীরের জনগণকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান করা।"

ভারত সরকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ছুঁতো ধরে, কাশ্মীরে যে নীতি অবলম্বন করেছে সে যুক্তি ধোপে টেকে না। ভারত সরকার নাকি এই হাঙ্গামায় উদ্বেগ ও আকুল এবং তাই সে সামরিক শক্তি সেখানে বজায় রেখে চলেছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা যদি বেঁধেই থাকে, তাহলে কেনো সেটা বেঁধেছে? এর গুঢ়ার্থ কেন উদ্ঘাটন করা হচ্ছে না? পাকিস্তানকে এভাবে দায়ী করা, ভারতের জন্য খুবই সুবিধাজনক একটা কারসাজি নয়কি? সামরিক শক্তিকে বহাল রাখাটাই তার আসল উদ্বেগের ভাব প্রকাশটা সত্যিকারের নয়, ওঠা ছুঁতো মাত্র। বরং কাশ্মীরের সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনগণের জন্য এটা একটা হুমকির মতো মনে হয়।

যদি মেনে নেয়া যায় যে, ভারত সরকার এ ব্যাপারে সত্যিকার অর্থেই উদ্বেগাকুল, তাহলে এ থেকে কাশ্মীরের জনগণের ভারত সরকারের প্রতি তাদের চমকপ্রদ আস্থাহীনতা এবং ৩৭ বছরের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত সরকারের চরম ব্যর্থতাকেও তাদের স্বীকার করে নিতে হবে। সর্বো-পরি, হাঙ্গামার অজুহাত দিয়ে, কোনো অবস্থাতেই কোনো দেশের মৌলিক নীতিসমূহকে বাতিল করা যায় না—যা ভারত করে চলেছে। তাহলে সেই নেকড়ে এবং মেষ শাবকের গল্পই আমাদের মনে পড়বে, যে মেষ শাবক ঝর্ণার তলদেশে দাঁড়িয়ে, আপনমনে পানি পান করছিলো; আর পাহাড়ের জঙ্গল থেকে এক ধেড়ে নেকড়ে ঝর্ণার উপর দিকে আবির্ভূত হলো।

লোভী নেকড়ের ইচ্ছ হলো, মেষ শাবককে ঘাড় মট্‌কে, তার রক্ত ও মাংস উদরস্থ করবে। নেকড়ে ছুঁতো খুঁজতে লাগলো। সে এক সময় ওপর থেকেই হাঁক মারলো,

: ওহে বেল্লিকের বাচ্চা, তুই আমার পানি ঘোলা করছিস্ কেনো? মেষ শাবক উপরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, নেকড়েটা ঝর্ণার শুরুর দিকে রয়েছে আর সে রয়েছে ঝর্ণার শেষ দিকে। তাই মেষশাবক বললো,

: তা কি করে হয় নেকড়ে মহারাজ? পানি তো আপনার ওদিক থেকেই নীচের দিকে নেমে আসছে। আপনি পানি ঘোলা করলে আমার পানি ঘোলা হতে পারে; আমি পানি ঘোলা করলে, তা আপনার দিকে যাবে না।

নেকড়ে পাল্টা যুক্তি খুঁজে পায় না। রেগেমেগে বলে,

: আমি এখানকার কথা বলছি না, গত বছর তুই আমার পানি ঘোলা করেছিলি।

মেষ শাবক হেসে বলে,

: আজব কথা শোনালেন মহারাজ। আমার বয়সই মাত্র ছ'মাস। এক বছর আগে আমি আপনার পানি কি করে ঘোলা করলাম? নেকড়ে এসব যুক্তি বা সত্যকে মেনে নিতে রাজী নয় — তার মূল উদ্দেশ্যকে সে চরিতার্থ করতে চায়—তার প্রয়োজন একটি ছুতো বা ছল। তাই সে মেষ শাবককে চোখ রাঙ্গিয়ে বলে,

: তুই ঘোলা না করলেও, তোর বাপ ঘোলা করেছিল—এইটুকু ছুতো ধরেই নেকড়ে দুর্বল ও নীরিহ মেষ-শাবকের ঘাড়ের ওপরে ঝাপিয়ে পড়লো। খলের কি কখনো ছলের অভাব হয়?

৮

'মহাত্মা গান্ধী' মুসলমানদের ওপর যে অবিচার করেছেন নেহেরু সে অন্যায় ও অবিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন

কাশ্মীরের মুসলমানদের প্রতি 'মহাত্মা গান্ধী' কি অবিচার করে গেছেন, সে তথ্যকে খোলাশা করতে হলে—আমাদেরকে আরো অতীতের কাশ্মীরে ফিরে যেতে হবে। যেহেতু কাশ্মীর বরাবরই একটি মুসলিম প্রধান রাজ্য—তাই এ রাজ্যকে হিন্দু নীতি ও আদর্শে পরিচালনা করতে গিয়ে, কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা সর্বদাই নতুন নতুন কৌশলের আশ্রয় নিতেন। এ ব্যাপারে জিয়াউল ইসলাম' নামে একজন লেখক তাঁর একটি লেখাতে (যে লেখাটির নাম ছিলো 'কাশ্মীর বিপ্লব' এবং যেটা ১৯৪৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিলো) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে গেছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে তার জের না টেনে, এটুকু শুধু বলতে পারি যে, শেষদিকে এসে হিন্দু মহারাজাকে যে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিলো, সেটা হিন্দু প্রধান রাষ্ট্রের সহযোগীতা। মহারাজা নিজে জনপ্রিয় ছিলেন না। তিনি জানতেন, যে কোন মুহূর্তে দেশবাসী তাকে সিংহাসন থেকে হটিয়ে দিতে পারে এবং সেখানে কোনো উত্তম মুসলমান বাদশাহ্‌কে তারা ক্ষমতা দান করতে পারে।

আর তাই যদি হয়, তাহলে এই মুসলিম রাজ্যে মুসলমান বাদশাহগণই স্থায়ীভাবে রাজত্ব করবেন। কাশ্মীর থেকে হিন্দু কর্তৃত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হবে। মহারাজা নিজেই কেবল কাশ্মীরের ওপর স্বীয় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব

বজায় রাখতে চাইলেন তা নয়, তিনি চাইলেন, কাশ্মীর বংশ পরাম্পরায় হিন্দু কর্তৃক শাসিত হবে। আর সে জন্যই তিনি শেষ কৌশল হিসেবে কোন শক্তিশালী হিন্দু প্রধান রাষ্ট্রের মাঝে কাশ্মীরকে সংযুক্তির কথা চিন্তা করে বের করলেন এবং স্বীয় বংশের অস্তিত্বকে বজায় রাখার ব্যাপারে এটাকেই তিনি একমাত্র গ্যারান্টি হিসেবে বিবেচনা করলেন।

'১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ান অ্যাক্টে' বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলো এবং দেশীয় করদ রাজ্য সমূহের সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় ফেডারেশান গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ফেডারেশান মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো, প্রদেশ ও রাজ্যগুলো এই ফেডারেশানের এক একটি ইউনিট হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আর তার কারণ হচ্ছে, ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসের পূর্বে বৃটিশ ভারতীয় স্ব-শাসিত প্রদেশ সমূহের কার্য পরিচালনার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করার কাজ সম্পন্ন করে যাননি। এর দু'বছর পরই বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ফেডারেশান গঠন হবার প্রথম দিকে যে ক'জন রাজা ফেডারেশানের দলিলে সাক্ষর দান করেছিলেন, কাশ্মীরের মহারাজা ছিলেন তাদের অন্যতম। যদিও সে সময়ের মধ্যে রাজ্যে একটা আইন পরিষদ গঠিত হয়েছিলো তবু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিষদের মতামত যাচাইয়ের প্রয়োজন ছিলো বলে মহারাজা মনে করেন নি। পক্ষান্তরে পরবর্তীকালে পরিষদের জনৈক সদস্য এ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার জবাব দিয়েছিলেন যে, রাজা ও ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক পরিষদের ক্ষমতার এক্তিয়ারভুক্ত নয়।

এলো ১৯৪২ সাল। দেশ বিভাগের প্রস্তাব উথাপিত হলো। কিন্তু এ সময়ে রাজ্য সরকার ইউনিটারী পদ্ধতির সরকারের প্রবর্তনকে সমর্থন জানালো। রাজ্যের মুসলিম কনফারেন্সদল এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু সে প্রতিবাদকে আমল দেয়া হলো না। বরংচ দেশ বিভাগের প্রাক্কালে (অর্থাৎ ১৯৪৬ এর শেষ এবং ১৯৪৭-এর শুরুর দিকে) ভারতীয় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

তাঁরা আগে থেকেই আঁটঘাট বাঁধতে শুরু করলেন, যাতে করে কাশ্মীরের মুসলমানগণের সুদীর্ঘকালের লালিত স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হতে না পারে ; মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র কাশ্মীর যেনো মুসলমান দ্বারা শাসিত না হতে পারে। এ জন্য মহারাজার হাতকে শক্ত করা দরকার—তাকে যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগীতা দেয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মাঝে যারা খুব বেশী তৎপর ছিলেন করমচান্দ গান্ধী অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী (?) তাদের মাঝে একজন ; তিনি কাশ্মীরে হিন্দু আধিপত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এতোই গরজ বোধ করলেন যে, নিজেই ঘন ঘন কাশ্মীরে যাতায়াত শুরু করে দিলেন।

শ্রীগান্ধীর তখোন আত্মপ্রচারের মহিমান্বিত তোড়জোড় চলছে। অতএব, এহেনো উদ্দেশ্যকে প্রকাশ্যে এবং সরাসরিভাবে বাস্তবায়ন করবেন তিনি কি করে ? তাই গোপনে কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে তার বৈঠক চলতে লাগলো। এই ষড়যন্ত্রের সামান্যতম আভাস পেয়ে গেলো কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়। তাদের দীর্ঘকালের ন্যায়সঙ্গত স্বপ্নকে ধূলিস্যাৎ করার চেষ্টা চলছে জেনে—কাশ্মীরের মুসলমানদের মাঝে ধোঁয়ায়িত অসন্তোষ দেখা দিলো। কাশ্মীরের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন রামচান্দ কাক্। তিনি কাশ্মীরের মহারাজা ও করমচান্দ গান্ধীর মধ্যকার

এই শলাপরামর্শ ও গোপন বৈঠকের উদ্দেশ্যকে ভালো চোখে দেখতে পারলেন না।

রামচান্দ কাক্ নিজে হিন্দু হলেও, অন্যায়ভাবে হিন্দু প্রাধান্যকে বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু নিজে প্রধান মন্ত্রী হয়ে, রাজ্য-প্রধান মহারাজার এই অন্যায়কে তিনি সংশোধন করবেন কি করে ? বিশেষ করে যেখানে করমচান্দ গান্ধীর মতো 'মহাত্মা-ব্যক্তি' জড়িত ও সক্রিয় রয়েছেন। নিজে হিন্দু হয়ে, হিন্দু-প্রভাবশালী গোষ্টির অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সহজ কথা নয়। তবু কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী রামচান্দ কাক্ মহারাজাকে এইটুকু মাত্র জানিয়ে, নিজ দায়িত্ব প্রতিপালন করেছিলেন যে,

ঃ আপনারা যদি মুসলিম-প্রধান রাজ্য কাশ্মীরকে ছলে বলে কৌশলে ভারতের পদানত করেন, তাহলে কাশ্মীরের জনগণের রুদ্র রোষ থেকে বাঁচতে পারবেন না। মুসলিম-প্রধান এই রাষ্ট্রটি মূলতঃ মুসলমানদেরই—এই সহজ সত্যটুকু আমরা অস্বীকার করার জন্য সচেষ্ট হলে, কাশ্মীরের দেহে অগ্নি-প্রদাহের সৃষ্টি হবে— যা করমচান্দ গান্ধীর মাহত্ব দিয়েও নেভানো কঠিন হতে পারে।

রামচান্দ কাক্ এই সত্যবাণী উচ্চারণ করে, নিজের বিপদই ডেকে এনেছিলেন। অন্যায়কে প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে যারা বিভোর, তারা প্রধান মন্ত্রী রামচান্দ কাকের এই ন্যায় কণ্ঠস্বরকে বরদাস্ত করতে পারেন নি ; অচীরেই শ্রী রামচান্দ কাক্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং এইমতো গোপন পদক্ষেপ নেয়া হয়, যাতে করে শ্রী রামচান্দ কাক্ আর কোনোদিনই ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করতে না পারেন।

এদিকে শেখ আবদুল্লাহ্‌কে ভারত তার 'হাতের গুটি' হিসেবে তৈরী করে, রাজনৈতিক দাবা খেলার শেষ চাল দেবার জন্য প্রস্তুত করে ফেলেছিলো। ভারত চাচ্ছিলো, অন্ততঃ তেমন একজন মুসলমানকে কাশ্মীরের

নেতা হিসাবে দাঁড় করাতে যাকে দিয়ে নিদান সময়টাতে ভারত কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। কাশ্মীরের সাধারণ জনগণ ভাববে, তাদের নেতা মুসলমান—অতএব তাকে মানা যায়; আর ভারত গোপনে সেই মুসলমান নেতাকে দিয়েই মুসলমানদের স্বার্থকে নস্যাৎ করে, হিন্দু ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত করবে। যাকে বলে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বা শত্রুকে দিয়ে শত্রু নাশ করা।

শেখ আবদুল্লাহ্‌র মগজ আগে থেকেই ধোলাই করা হয়েছিলো—কাশ্মীরের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের লোভ তার সামনে টোপ হিসেবে ধরা হয়েছিলো; আর আবদুল্লাহ্‌ও সে টোপ ভালোভাবে গিলে বসলেন। তিনি জোর প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। এ ব্যাপারে তিনি ভারতের নিকট দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। কাজ চলতে লাগলো প্রকাশ্যে ও গোপনে এবং অত্যন্ত তোড়ে জোড়ে। কিন্তু কাজের শেষ দিকে এসে, শেখ আবদুল্লাহ্‌ নিজেও এই প্রবল জনমতের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরন করতে সাহস পাইলেন না। যে জন্য এই অন্তর্ভুক্তির কথা ঘোষিত হবার ঠিক পাঁচদিন আগে, শেখ আবদুল্লাহ্‌ তার কোন একটি ভাষণে বলেই ফেললেন, 'রাজ্যের মুসলিম জনতা ভয় করছে যে, ভারতের সঙ্গে যোগদান তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনবে।'

এই ধরনের প্রতিকূল জনমত সত্ত্বেও, কাশ্মীরের মহারাজা তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন—কাশ্মীরকে তিনি ভারতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে ছাড়বেনই। এই গভীর ষড়যন্ত্রটা এতোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো যে, বহির্বিশ্বের নিরপেক্ষ মানব গোষ্ঠীরাও এটা জানতে পেরে, কাশ্মীরের মহারাজার প্রতি নিন্দেবানী পেশ করলো। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন

পত্রিকার ভাষ্যকারগণও সোচ্চার হয়ে উঠলেন। এখানে গোটা দু'য়েক পত্রিকার মতামত তুলে ধরা হলো :

[ক] উইকলী ইকনমিষ্ট, (লণ্ডন) :

এই পত্রিকা কাশ্মীরের মহারাজাকে 'স্বৈরাচারী সরকার' হিসেবে আখ্যায়িত করে বললো, "কাশ্মীরের বর্তমান সরকার কি জনমতের তোয়াক্কা করছে না? তারা এক বিপুল জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধাচারন করতে চাইলে তার পরিনতি ঐ অঞ্চলের জনতা বা শাসকের জন্য কতোটা মঙ্গলজনক হবে; তা চূড়ান্ত কাজটির আগে পুনর্বার ভেবে নেয়া ভালো। ··· এতদসত্ত্বেও, সবকিছু জেনেশুনেই কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা ভারতের সাথে যোগদানের প্রতি আগ্রহশীল বলেই মনে হয় এবং কাশ্মীরে যদি স্বৈরাচারীর অধিকারকে একমাত্র নিয়ম বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়, তাহলে মহারাজা আগে বা পরে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নিজেকে স্বৈরাচারী হিসেবে প্রমান করবেন।"

[খ] দ্য নিউ ষ্টেট্‌সম্যান :

বর্তমানে যে পত্রিকাটি 'নিউ ষ্টেট্‌সম্যান' নামে বিশ্বে সমোধিক খ্যাত; তখোন তার নাম ছিলো 'ষ্টেট্‌সম্যান অ্যাণ্ড নেশন।' তদানীন্তন 'ষ্টেট্‌সম্যান অ্যাণ্ড নেশন' লিখলো, "কাশ্মীর একটি মুসলিম রাষ্ট্র—যেহেতু এর অধিকাংশ জনতাই মুসলমান। অথচ বড্ড মর্মান্তিক অধ্যায় এটাই যে, এটা একজন হিন্দু কর্তৃক শাসিত হচ্ছে যে অত্যন্ত খারাপভাবে এবং নিতান্তই নির্যাতনের মাধ্যমে তাদেরকে শাসন করছেন। কাশ্মীরের জনতা চায়, স্বাধীনতা অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে—কিন্তু হিন্দু রাজা

তা হতে দেবেননা—তিনি ভারতের সঙ্গে একে অঙ্গীভূত করতে বদ্ধপরিকর কিন্তু যোগদানের প্রান্ত সীমায় দাড়িয়েও তিনি তার ইতস্ততাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।"

একজন প্রবীন মুসলিম রাজনীতিক বললেন, "...ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাটা এসেছে এমন একজন হিন্দু পুরাধার মগজ থেকে, যার মগজ অত্যন্ত সাফা এবং এই নিন্দনীয় পরিকল্পনার জন্য বিশ্ববাসী যাকে কোনোদিনও ছুয়বার কথা ভাবতেও পারবে না—কারণ তিনি বর্তমানে বিশ্বের একজন শীর্ষস্থানীয় মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন ; তবে কালচক্র যে তাকে কখনো মুখশহীন করতে পারে, তা আন্দাজ করা যায় এ জন্য যে, সত্য কখনো চাপা থাকে না।"

জিয়াউল ইসলাম নামে জনৈক লেখক পরবর্তীকালে খুব স্পষ্টভাবেই লিখেছিলেন, "ভারত সরকার যা করতে চলেছে—বিশেষভাবে কাশ্মীর সংক্রান্ত এই গোলযোগের ব্যাপারটা, তা সম্ভবতঃ মহাত্মার আকার ইঙ্গিতেই এবং এতে পাকিস্তান পাঁচটি অকাট্য যুক্তির অবতারনা করবে।

প্রথমতঃ দেশ বিভাগের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন,

দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্যে জনতার আকাঙ্খাকে নস্যাৎ করা,

তৃতীয়তঃ পাকিস্তানের সঙ্গে বলবৎ থাকা স্থিতিবস্থা চুক্তিকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে আইন সঙ্গত বাধা,

চতুর্থতঃ মহারাজার ওপর জনতার আস্থাহীন অবস্থা সৃষ্টি হবার পর, তার কর্তৃত্বে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের অ-গ্রহণ যোগ্যতা,

পঞ্চমতঃ ভারতের নিজস্ব স্বীকৃতি হচ্ছে, 'যা কিছু করা হবে তা সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষ। কিন্তু ভারত তার নিজস্ব স্বীকৃতি অটুট রাখতে পারবে, কারণ তার লক্ষ্য অন্য।"

জিয়াউল ইসলামের ভবিষ্যৎ বানী সত্যে পরিনত হয়েছিলো। কোনো এক মোক্ষম সময় বুঝে, কাশ্মীরের পলায়নপর মহারাজা এই অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান তা মেনে নেবার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। ভারত সরকার ও কাশ্মীর সরকারের এই লেনদেনকে বাইরের অনেকেই 'অসিদ্ধ প্রথায় সম্পাদিত কাজ' হিসেবে উল্লেখ করলো। বহির্বিশ্ব থেকে প্রবল চাপ আসতে পারে মনে করে, ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলো, "আমরা কাশ্মীরের জনতার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করছি।"

মহাত্মা গান্ধীকে এই অশুভ পরিকল্পনার উদ্যোক্তা এবং নেহেরুকে তার প্রয়োগকর্তা হিসেবে উল্লেখ করে, জিয়াউল ইসলাম লিখলেন, 'মহাত্মা গান্ধী কাশ্মীরের মুসলমানদের ওপর যে অবিচার করেছেন, নেহেরু সে অন্যায় ও অবিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।'

কারণ হিসেবে, মিঃ ইসলাম লিখলেন, ক্যাম্পবেল জনসণ জানাচ্ছেন যে, "মাউন্ট ব্যাটেন অর্থাৎ মিশন উইথ মাউন্ট ব্যাটেন (Mission With Mount Baten) চেয়েছিলেন মহারাজার অন্তর্ভুক্তি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যে জবাব দেবার জন্য তার সরকার তাকে নির্দেশ দিয়েছিলো তাতে এটা যে আইন শৃংখলা পুনঃ স্থাপনের পর পরই জনসাধারণের ইচ্ছা নির্দ্ধারনের শর্ত সাপেক্ষ—এ কথা জানাতে দেয়া হোক ; এই নীতি সবাই একবাক্যে গ্রহণ করেছিলো এবং নেহেরু কর্তৃক প্রস্তাবিতও হয়েছিলো।"

গভর্নর জেনারেল লিখেছিলেন ঃ

মহারাজার কাছে লিখিত "অনুমোদন পত্রে" গভর্ণর জেনারেল লিখেছিলেন, "যেখানে অন্তর্ভুক্তির সমস্যা বিরোধের বিষয়, যেখানে জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী যোগদানের বিষয়টি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। * * *

তাদের এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে আমার সরকার ইচ্ছা করেন যে, যে মুহূর্তে কাশ্মীরে আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কাশ্মীর হানাদার থেকে (কাশ্মীরের নির্যাতন প্রতিরোধকারী জনগণকে ভারত সরকার যে প্রচার-নামে আখ্যায়িত করেছে) মুক্ত হবে ; ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজ্যের যোগদানের বিষয়টি গণ নির্দেশের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত।"

শ্রী নেহেরুর ধোকাবাজী :

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেহেরু বৃটিশ ও পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের আচরন সম্পর্কে জানাতে গিয়ে—এর ওপর রাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির খোলস পরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন মনে করেছিলেন। একই সময়ে এক বেতার ভাষনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু বলেছিলেন :

> "আমরা ঘোষণা করেছি যে, কাশ্মীরের ভাগ্য জনসাধারণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হবে। এই প্রতিশ্রুতি আমরা যে কাশ্মীরের জনসাধারণকে দিয়েছি, তা নয়, বরং সমগ্র বিশ্বকে দিয়েছি ; এবং মহারাজ্য তা সমর্থন করেছেন। আমরা এই প্রতিশ্রুতি পালনে পরাম্মুখ হব না এবং হতে পারি না। যখন রাজ্যে শান্তি, আইন ও শৃংখলা পুনঃ স্থাপিত হবে তখন' জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক সংস্থার তত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আমরা চাই এই গণভোট সৎ ও নিরপেক্ষ হবে এবং আমরা কাশ্মীরের জনগণের রায় মেনে নেবো।

> এর চেয়ে পক্ষপাতহীন ও ন্যায় সম্মত প্রস্তাব আমি কল্পনাও করতে পারি না।

এটা ছিলো একটি মিষ্টি ফাঁকা বুলি মাত্র। বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে দাক্ষিন্যের সামান্য আভাসও একে বলা যায়। আসল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাথমিকভাবে এ বুলি আওড়ানোর প্রয়োজন ছিলো। কারণ, শেষাবধি যেটা করার সেটা 'কালক্ষেপিত সময়ের' হাতিয়ার দিয়েই করা যাবে। আর সে জন্যই নেহেরু মশাই তার মিষ্টি কোটিং-এর বুলির মাঝে বেশ একটা 'শর্ত' নামের 'ফাঁক' রেখে গেছেন। আর সেই ফাঁক্‌টা হচ্ছে 'রাজ্যে যখোন আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবে'—এই কথাটা। অর্থাৎ "ন'মণ তেলও জুটবে না আর রাধাও নাচবে না।"

ফলতঃ আমরা দেখতে পাই, পরবর্তী কয়েক বছর ধরে, ভারতীয় কর্ম্মকর্তাগণ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে বার বার শুধু সেই ফাঁকা মিষ্টি বুলিটিই আউড়ে চলেছেন। কারণ, তারা চান শুধু সময় গড়িয়ে দিতে। সময় গড়িয়ে চলুক— ভারত তার আসল গুছগাছটা এর-মধ্যেই সেরে ফেলবে। ঠিক এই নীতির ফলশ্রুতি দেখা গেলো। সময় সরে গেলো। ভারত তার কার্য পদ্ধতি পাল্টে দিলো ; একদিন সকালে শ্রী নেহেরু নতুন ঘোষণা দিয়ে বসলেন :

> "এই রাজ্য ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। অতএব, এ নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার আর কিছু নেই—ভারতের সঙ্গে এর অন্তর্ভুক্ত অপরিবর্তনীয়।"

সোজা কথায় জিয়াউল ইসলামের ভাষায় বলা চলে, মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের ওপর যে অবিচার করে গেছেন, নেহেরু এবং তার দলের লোকেরা সে অন্যায়কে সু-প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়লেন।

৯

শুরু হল যুদ্ধ

ভারত ষড়যন্ত্রের ভিত যতোই পাকা করতে লাগলো ; কাশ্মীরের অভ্যন্তরে ততোই ধোঁয়ায়িত দাবানল তার লেলিহান শিখা বিস্তার করতে লাগলো। কাশ্মীরের জনতা তাদের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত 'আজাদ কাশ্মীর সরকারের' বুনিয়াদ পাকা করতে লাগলো। আজাদ কাশ্মীরের এই জনগণের সাথে এসে যুক্ত হলো পাকিস্তান ও কাশ্মীর উভয় এলাকার উপজাতি। শুরু হলো সংঘর্ষ।

আজাদ কাশ্মীর বনাম ভারতীয় সৈন্য।

একদল স্বাধীনতা চায়। অন্যদল তাদের দমিয়ে রাখতে চায়।

খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ। এখানে সেখানে যুদ্ধ।

যুদ্ধ অবিরাম চলছে।

এই যুদ্ধের ছিটে ফোঁটা আরো অনেক আগেই শুরু হয়েছিলো। কিন্তু ভারতের 'মিষ্টি বুলি' ও 'নানান আশ্বাসে' তা কখনো ধীরে কখনো ক্ষান্ত দিয়ে চলছিলো। এবার সেটা প্রচণ্ডতর রূপ ধারণ করে বসলো। এই ভীষণতর রূপ ধারনের কারণ একটিই—'কাশ্মীরকে চিরতরে ভারতের মাঝে অন্তর্ভূক্তিকরণ।' অথচ গোড়া থেকে এই 'অন্তর্ভূক্তি' পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার প্রথমে মহারাজার সঙ্গে ও ভারত সরকারের সঙ্গে এবং তারপর কেবলমাত্র ভারত সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে এই বিরোধের মীমাংসা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু দিন যতোই গড়াতে লাগলো ভারত সরকারের কাছে প্রত্যক্ষ আলোচনার প্রস্তাব করা ততোই ক্রমবর্ধমানভাবে নৈরাশ্যজনক হয়ে উঠলো। এতদ্‌সত্বেও পাকিস্তান

কমপক্ষে পাঁচবার এই প্রচেষ্টা চালালো। কিন্তু প্রতিবারই ভারতের গড়িমসির কারণে শান্তিপূর্ণ মিমাংসার পথটি রুদ্ধ হয়ে যায়।

প্রথম প্রচেষ্টার কথাই ধরা যাক। গোড়ার দিকেই তা করা হয়েছিলো ১৯৪৭ সালের ২৯ শে অক্টোবরে অর্থাৎ এই 'অন্তর্ভূক্তির' কয়েকদিন পরেই। জিন্নাহ সাহেব নিজেই উপযাজক হয়ে একটি আলোচনা সভার প্রস্তাব দিয়েছিলেন—যে বৈঠকে পাকিস্তান ও ভারতের গভর্নর জেনারেল প্রধানমন্ত্রীগণ ও কাশ্মীরের মহারাজা এবং তার প্রধান মন্ত্রীর উপস্থিত হবার কথা ছিলো। কিন্তু সে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারলো না। কারণ, নেহেরু জানালেন, তিনি সহসাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

দ্বিতীয় দফার প্রস্তাবও বানচাল হয়ে যায় ভারতের গড়িমসির কারণে। ভারত মূল প্রসঙ্গ রেখে, অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে ওঠে। সে অভিযোগ আনে, পাকিস্তান কোনো ভারতের ব্যাপারে 'প্রতারনামূলক যোগদান' জাতীয় শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করলো—তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে পাকিস্তানকে।

কাশ্মীরের আভ্যন্তরীন যুদ্ধ যখোন চরম রূপ ধারন করলো ; মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখোন বাধ্য হয়ে, পুনঃ বৈঠকের আয়োজন করলেন। কিন্তু ভারত তাতেও গা করলো না ; বরং সে গোপনে কাশ্মীরে তার সামরিক মদদকে আরো জোরদার করে তুললো। জিন্নাহ্‌ ভারতের বিকল্প হিসেবে, লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত তিনদফা প্রস্তাব পেশ করলেন।

প্রথম দফা ঃ অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ঃ

গভর্ণর জেনারেলদ্বয়কে তাঁদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক কাশ্মীরে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে বিবাদমান সেনাবাহি-

নীগুলিকে নির্দেশ দানের ক্ষমতা দেয়া উচিত। যুদ্ধেরত 'আজাদ কাশ্মীর সরকার বা 'উপজাতিদের' উপর পাকিস্তান সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রন না থাকা সত্বেও তাদেরকে এই মর্মে স্পষ্টভাষায় পাকিস্তান সতর্ক করে দিতে রাজী ছিলো যে, তারা যদি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ না করে, তাহলে উভয় ডোমিনিয়ন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

দ্বিতীয় দফা : সৈন্য প্রত্যাহার :

ভারতীয় ডোমিনিয়ন ও উপজাতি উভয়ের সেনাবাহিনীকে একসাথে এবং শীঘ্রই রাজ্য এলাকা থেকে প্রত্যাহার করতে হবে।

তৃতীয় দফা : গণভোট :

গভর্ণরদ্বয়কে তাঁদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক রাজ্যে শান্তি পুনঃ স্থাপন, প্রশাসনের ব্যবস্থা এবং তাঁদের যুগ্ম নিয়ন্ত্রন ও তত্বাবধানে অবিলম্বে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেয়া উচিত।

মিঃ নেহেরু বুঝলেন, এ ন্যায্য পথে গেলে, কাশ্মীরবাসীর ওপর থেকে ভারতীয় চাপটা কমে যাবে। তাই কায়েদে আজমের প্রস্তাবিত এই তিন দফাকে বাস্তবায়িত করার পূর্বে, নিজের তিনটি শর্তকে এ পথের প্রতিবন্ধক হিসেবে তুলে ধরলেন। মূলতঃ তিনি অনেকগুলো ওজর আপত্তিই তুলেছিলেন ; তার মাঝে তিনি নিম্নোক্ত তিনটি ওজর আপত্তিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন।

নেহেরুর প্রথম ওজর :

'হানাদারদের' কাশ্মীর থেকে সরে যাওয়ার জন্য বাধ্য করার ব্যাপারে পাকিস্তানকে একটি প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

নেহেরুর দ্বিতীয় ওজর :

নেহেরু বললেন, 'হানাদারদের' কাশ্মীর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়ন না করা পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরে অবস্থান করবে।

নেহেরুর তৃতীয় ওজর :

নেহেরুর তৃতীয় ওজরটি মূলতঃ ছিলো, কাশ্মীরের জনগণ এবং বিশ্ববাসীকে ভারতীয় বদান্যতা ও ন্যায় পরায়নতা দেখাবার একটা কৌশলময় ধোকাবাজী মাত্র। তৃতীয় ওজরে নেহেরু বললেন, গণভোটটা হবে জাতিসংঘের তত্বাবধানে। কিন্তু একথায় নেহেরু তো কাশ্মীরের ও জাতিসংঘের লোকদেরকে নেহায়েত খুশীকরে, নিজ কাজ হাসিল করে নেবার জন্য কালক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। প্রথম দু'টি শর্তে নেহেরু মূলতঃ কাশ্মীরবাসীদেরকে তাদের পবিত্র আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

নেহেরু কখনোই কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার চিন্তা করতেন না। তার বাহানা ছিলো, সৈন্যরা হানাদারদের উৎখাত করবে। আর তার কথায় মনে হতো, হানাদারদের যেনো কোন শেষ নেই।

১০

লিয়াকত আলী খানের পদক্ষেপ

ভারতের তাল বাহানা চলতেই লাগলো। সে সৈন্য প্রত্যাহার করছেই না। ১৯৫০ সাল এসে গেলো। তখোন লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের মন্ত্রী। তিনি ভারতের এই যুক্তিহীন ও জবরদস্তিমূলক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি নতুন আবেদন রাখলেন তাঁর এক সুদীর্ঘ চিঠিতে। চিঠির উদ্দেশ্য ছিলো, ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া; যাতে করে এই তিনটি অঞ্চলের জনবাসীর মাঝে একটি হৃদ্যতামূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। আর সেজন্য তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর একটি চুক্তি সম্পাদনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই চুক্তির শর্তাবলীতে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যুক্তি-সঙ্গত বিষয়গুলো মেনে নিতে হবে এবং এর মূল লক্ষ্য হবে দু'দেশের মাঝে বিরাজমান বিরোধগুলো আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।

যদি এতেও বিরাজমান বিরোধের নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে প্রয়োজনে **মধ্যস্থতার মাধ্যমে** এর মিমাংসা করা হবে—এই মতো আশ্বাসও লিয়াকত আলী খান দিয়েছিলেন। লিয়াকত আলী খানের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে, পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে কোনো বিরোধই এভাবে অনিদৃষ্টকাল যাবৎ চলতে পারতো না, এ কথা নির্দিধায় বলা যায়। বিরোধের স্থিতিবস্থায় কোন পক্ষেরই যে কোনো অসুবিধা হবে না; তা কাশ্মীরের মতো একটি গুরুতর সমস্যা থেকে সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু ভারত এ চুক্তিতে রাজী হননি। আর ভারতের এই রাজী না হওয়ার গোপন কারণটিও সহজেই অনুমেয়। ভারত, পাকিস্তানের প্রতি, তথা পার্শ্ববর্তী দেশ ও মুসলমানদের প্রতি কি মতলব পোষণ করে; তা পরিস্কার হয়েছে ১৯৬৫ সালে তার সহসা পাকিস্তানকে আক্রমন করে বসার ন্যক্কারজনক ঘটনা থেকে। এই চুক্তিতে রাজী হলে, ভারত কি পাকি-স্তানকে এভাবে আক্রমণ করতে পারতো?

ভারতের গড়িমসির কারণে লিয়াকত আলী খানের প্রস্তাবিত এই চুক্তিও বানচাল হয়ে যায়। ভারতের দীর্ঘসূত্রী পত্রালাপের কারণে এবং অযৌক্তিক কথারার্তায় এই চুক্তির মূল ব্যাপারে পাকিস্তান কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শেষ দিকে এসে এই চুক্তির ব্যাপারে তার' গররাজী মূলক' মনোভাবকে স্পষ্টই ব্যাক্ত করেন। শুধু তাই নয়—তিনি এই প্রস্তাবের জন্য পাকিস্তানকে হেয় ও মতলববাজ' প্রমানের জন্য জনগণ নিয়ে হৈ চৈ করারও চেষ্টা করেন। এই চুক্তির কথাগুলো কি ন্যায়সঙ্গত ছিলোনা? একবার চুক্তির প্রস্তাবিত মূল বিষয়গুলো দেখুন:

'যুদ্ধ নয়' চুক্তি:

শর্ত: (ক) উভয় দেশের সৈন্য বাহিনী কোন অবস্থাতেই কেউ কারো সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবে না। যে তা করবে, আন্তর্জাতিক আদালতে তাকে আসামীর ভূমি-কায় দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

শর্ত: (খ) উভয় দেশের মাঝে আভ্যন্তরীণ কোনো কোন্দল দেখা দিলে, তাতে অপরপক্ষ কখনোই নাক গলাবেন না —

যদি কিনা তা উক্ত পক্ষের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না হয়।

শর্ত : (গ) যদি কখনো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন্দল দেখা দেয়; তবে তা যুদ্ধের মাধ্যমে নয়; বরং উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার মাধ্যমে সমাধা করা হবে।

শর্ত : (ঘ) উভয় দেশের মাঝে পূর্ব থেকে বিরাজমান বিরোধসমূহ—একই পন্থা [শর্ত (গ) মোতাবেক] নিস্পত্তি করা হবে।

শর্ত : (ঙ) যদি এমন কোন বিরোধ দেখা দেয়, যা উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের টিম্ (Team) নিস্পত্তি করতে পারছে না; তখোন উভয় দেশ আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকে উভয়ের মনোনীত এক বা একাধিক রাষ্ট্রকে মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসেবে মেনে নিয়ে, এই বিরোধের মিমাংসা করাবে।

অর্থাৎ পাকিস্তান বা ভারত কোনো অবস্থাতেই কেউ কারো বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেউ কারো ক্ষতির চেষ্টা করবে না। কিন্তু যে ভারতের জন্য মূলতঃ এই চুক্তি, সে ভারত এই চুক্তির শেকলে তার সর্বনাশা হিংস্র শিংহুটোকে বাঁধতে রাজী হবে কেনো? বরং সে তার অভিষ্ট লক্ষ্যের পথে তার গোপন পদক্ষেপ নিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না।

১১

শেখ আবদুল্লাহকে বন্দী করা হল! দেড় হাজার বিক্ষোভকারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো এবং......

শেখ আবদুল্লাহ্ প্রথম দিকে ভারতের মুখপাত্র হয়ে ছদ্মবেশে কাজ করতে থাকলেও; কাশ্মীরের জনতার প্রতি ভারতীয় সরকার ও সৈন্যের অকথ্য নির্যাতনে তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। দেশপ্রেম তাঁকে সজাগ ও সচেতন করে তোলে। তিনি বুঝতে পারেন, কাশ্মিরী জনতার আশা-ভরসা ও কণ্ঠস্বর হয়ে, তিনি ভারতীয় চালে যা কিছু করে চলেছেন, তা জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজ—জনতার সঙ্গে, তথা দেশবাসীর সঙ্গে বেঈমানীর কাজ।

তাই অকস্মাৎ তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টাতে চাইলেন—জনতার ইচ্ছানুযায়ী কাশ্মীরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে, পাকিস্তানী সাহায্য কামনা করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর পেছনে আগে থেকেই ভারতীয় গুপ্তচর লাগানো ছিলো। তাই শেখ আবদুল্লাহ্র এই গোপন ইচ্ছাও জেনে ফেললো ভারত সরকার। কাশ্মীরের জনতার শেষ ইচ্ছাও শেখ আবদুল্লাহ পূরণ করে যেতে পারলেন না।

১৯৫৩ সালের ৯ই আগষ্ট, কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহকে ভারত সরকার সহসা, অতর্কিতে পদচ্যুত করে ও বন্দী করে। কাশ্মীরের মুসলিম জনতা সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা কাশ্মীরকে

পূর্ণভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত সরকার এই গণ-বিক্ষোভকে কঠোর হস্তে দমন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সামরিক শক্তির সাহায্যে কোনোমতে এই গণ-বিক্ষোভকে দমন করতে না পেরে, ভারত সরকার বিক্ষোভকারী মুসলিম জনতার অগ্রগামী দেড় হাজার জনতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং চিরতরেই তারা কাশ্মীরের স্বাধীনতাপ্রিয় জনতার কণ্ঠস্বরকে নিভিয়ে দিতে চায়।

হত্যার প্রতিক্রিয়া ঃ

পার্শ্ববর্তী একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের মাঝে এহেনো 'মুসলিম-নিধন' কর্মকাণ্ড পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ, মর্মাহত ও ক্রোধান্বিত করে। ভারতীয় বাহিনীর এই পদক্ষেপের ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পেরে, পাকিস্তান রীতিমতো শিউরে ওঠে। এই পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত বিপদের কথা অনুধাবন করে, উদ্বিগ্ন হন পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী ; তিনি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতকে অবিলম্বে বৈঠকের আয়োজন করতে আহ্বান জানান।

জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠানের দাবী সম্বলিত এই চিঠি পেয়ে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে গড়িমসি করতে থাকলেও তাদের এই অন্যায় কাজের অশুভ পরিনতির কথা চিন্তা করে, ইতস্ততঃ ভাবটা কাটিয়ে উঠে, শেষমেষ রাজী হন। বৈঠক বসে। এরপর উভয় মন্ত্রীদ্বয়ের পক্ষ থেকে এক যুক্ত ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হয়।

প্রধান-মন্ত্রীদ্বয়ের যুক্ত ইশতেহার ঃ

জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মাঝে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তার মূল বিষয় হলো দুটি—(ক) কাশ্মীরে

এই গণহত্যার তদন্ত কমিশন গঠন ও (খ) কাশ্মীরীদেরকে তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। কিন্তু ভারতের ঘোরতর আপত্তি ও তীব্র বিরোধিতার কারণে, গণহত্যার তদন্ত কমিশন গঠন করা কিছুতেই সম্ভবপর হয়নি ; কারণ এতে ভারত বেঁকে যায় এবং বৈঠক ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অগত্যা পাকিস্তান ভারতকে দিয়ে অন্ততঃ একটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। ফলতঃ নিম্নলিখিত নির্ধারিত ভিত্তিতে ইশতেহার প্রকাশ করা হয় ঃ

(১) জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের ইচ্ছার ভিত্তিতে রাজ্যে এক অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিরোধের সমাধান করতে হবে।

(২) গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে গণভোটের পরিচালক নিয়োগ করতে হবে।

(৩) এই তারিখের পূর্বে যে সকল প্রাথমিক বিষয় (যেমন রাজ্য থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্ন, যা এ যাবৎ গণভোট অনুষ্ঠান বন্ধ করে রেখেছিলো) সেগুলোর মীমাংসা করে ফেলতে হবে। প্রধান মন্ত্রীদের পরামর্শদানের জন্য সামরিক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কমিটি সমূহ নিয়োগ করতে হবে।

ভারত বুঝতে পারলো, এবার তাকে কাশ্মীরের ওপর থেকে তার বিষদাঁত তুলে নিতেই হবে। তাই সে এই যুক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষরদানের পর থেকেই পুনঃ চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং অনেক ভেবে চিন্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরো কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাবনা উথাপন করে, এই যুক্ত ইশতেহারের সঙ্গে যুক্ত করে।

ভারতের নতুন প্রস্তাবনা :

যুক্ত ইশতেহার তখনো প্রকাশ করা হয়নি, কেবলমাত্র উভয় পক্ষ স্বাক্ষরান্তে আলাপ আলোচনা করছে সেই সময় ভারত এই নতুন প্রস্তাবনা পেশ করে। এগুলো হচ্ছে :

(ক) গণভোটের ফলাফল ভৌগলিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থা সাপেক্ষ হবে।

(অর্থাৎ এর মানে দাঁড়ালো, এমন কি এই গণভোট অনুষ্ঠানের পরও এই বিরোধ মিমাংশার কোনো নিশ্চয়তা রাখা হলো না।)

(খ) জম্মু ও কাশ্মীরের পাঁচ লক্ষ মোহাজেরকে এই গণভোটে অংশ নিতে দেয়া হবে না।

(গ) অ্যাডমিরাল নিমিৎসকে গণভোট পরিচালকের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে এবং তাঁর স্থানে কোনো ক্ষুদ্র এশীয় রাষ্ট্রের একজন অধিবাসীকে নিয়োগ করতে হবে।

১২

ভারতের কূটজাল বিস্তার : ব্যর্থ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ; ব্যর্থ আইসেন হাওয়ার !

যখোন এসব আলোচনা চলছিলো এবং পাক-ভারত কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি বিস্তারিত আলোচনা করছিলেন সে সময় (১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে) ভারতের প্রধান মন্ত্রী আসন্ন "পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি"-র সংবাদের সুযোগ গ্রহণ করলেন। পূর্বাহ্নে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সমূহের চাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সংবাদকে একটা উপযুক্ত 'ছুঁতো' হিসেবে আঁকড়ে ধরলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইনিয়ে বিনিয়ে অন্য এক প্রসঙ্গের অবতারনা করলেন। তিনি অযৌক্তিক যুক্তি প্রদর্শন করে বললেন,

: পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সাহায্য কাশ্মীর আলোচনার ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে এবং এর ফলে রাজ্য থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্নটি নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করবে।

ভারতীয় কাগজগুলিতে তদীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য, ফলাউ করে উক্ত শীরোনামে প্রচারিত করা হলো। এই অযৌক্তিক যুক্তিটা সেই কবিতাংশের মতোই হাস্যস্কর ছিলো যে,

'এপার থেকে মারলাম ছুরি
লাগ্‌লো কলাগাছে,
হাঁটু দিয়ে রক্ত ঝরে
চোখ গেলোরে বাবা।'

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বৃথাই তাঁর ভারতীয় বিকল্পকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে,

: পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সাহায্যের সাথে কাশ্মীরে মুক্ত ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।

আইসেন হাওয়ার নিজেই এসেছিলেন 'পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির' ব্যাপারে। তিনি বললেন,

: পাকিস্তানের সঙ্গে এই চুক্তিটা কি ধরনের, সেটাই আগে ভারতের জেনে নেয়া দরকার।

আইসেন হাওয়ার নিজেই পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্যের এই ধরণটাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরলেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! ভারত, সব বুঝেও না বোঝার ভান করলো, সব জেনেও না জানার ভঙ্গী ধরলো। তাঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, ব্যর্থ হলেন স্বয়ং আইসেন হাওয়ার। সবার সামনেই ভারত তার কূটজাল বিস্তার করে চললো।

সুতরাং এই ছুতো ধরে, ভারতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি আর কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে দিলো না। সমস্ত আলোচনাই বন্ধ হয়ে গেলো!

১৩

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পদক্ষেপ!

এর কিছুকাল পরে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করলেন। তিনি এই বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য পুনঃ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি এক বক্তৃতায় বললেন,

: আমরা ভারতের সাথে সংঘর্ষ চাইনা। কারণ এ ধরনের সংঘর্ষ হলে, ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই ধ্বংস হবে। তাই আমি ঘোষণা করছি যে, একটা শান্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক সমাধানের দরজা আমাদের তরফ থেকে সব সময়ই খোলা থাকবে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ভারত সরকারের মতো মিথ্যে ও ফাঁকা বুলি আওড়াতে জানতেন না। তাঁর এই ঘোষণা বাস্তব ব্যবস্থার দ্বারা অনুসরিত হয়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসার সময় তিনি দিল্লী বিমান বন্দরে অবতরণ করেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক জরুরী মিটিং-এ মিলিত হন। তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে কাশ্মীর বিরোধের আশু সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে-ছিলেন। কারণ, বিরোধ তখনো চলছিলো এবং এই বিরোধের ফলে উভয় দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটছিলো এবং উভয় দেশের শক্তি ক্ষয় হচ্ছিলো।

নেহরুকে আমন্ত্রণ!

১৯৬০ সালের মে মাস। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন চলছিলো তখোন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও মিঃ নেহেরু তখোন আর একবার

বৈঠকে মিলিত হবার সুযোগ পান এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সে সময় মিঃ নেহেরুকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সিন্ধু অববাহিকার পানি চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের উদ্দেশ্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেহেরু পাকিস্তান সফর করেন। সে সময় তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আহবানে, পাক-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনার মধ্যে 'কাশ্মীর বিরোধের বিষয়টি' বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিলো। আলোচনা শেষে যে ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছিলো তা নিম্নরূপ।

আইয়ুব-নেহেরু যুক্ত ইশতেহার!

ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছিলো ঃ

> প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে কাশ্মীর সম্পর্কে খোলা-খুলি ও বন্ধুত্বপূর্ণ মত বিনিময় হয়েছে। আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এটা একটা জটিল প্রশ্ন যার সকল দিকের সতর্কতাপূর্ণ বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। একটা সুষ্ঠ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আরো চিন্তা করা সম্পর্কে একমত হয়েছেন।

নেহেরু, আইয়ুব খান, মার্কিনের হ্যারিমম্যান, বৃটেনের ডান্‌কান্‌, 'প্যাণ্ডোরার বাক্স' ও দিল্লী-পিণ্ডি যুক্ত ইশতেহার!!!

যে নেহেরু যুক্ত ইশ্‌তেহারে বললেন,

ঃ এ বিষয়ে আরো চিন্তা করা হবে। সেই নেহেরুই ভারতে ফিরেই সাংবাদিকদের নিকট মন্তব্য করলেন,

ঃ কাশ্মীরে যা চল্‌ছে, তাই-ই চলবে। কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার কোনো পরিবর্তন কেউ যদি করতে চায়, তাহলে সে একটি 'প্যাণ্ডোরার বাক্স-ই খুলে বসবে।

ভারতীয় নীতি, আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সুধী পাঠক পাঠিকাবৃন্দ —এবার নিজেরাই কিছু একটা মন্তব্য করুন।

কারণ, ভারত সত্যি সত্যিই পাকিস্তানকে আর কোনো আলোচনায় এগুতে দেয়নি—বরং দিনে দিনে কাশ্মীরে দাঙ্গার রূপ পরিবর্তন করা হয়েছে; দাঙ্গায় নিহত মুসলিম পরিবারের শূন্য স্থানে হিন্দু পরিবারকে এনে বসানো হয়েছে; ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে যাতে করে কাশ্মীরে যেনো কখনো মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের জন্মগত অধিকার স্বাধীকারের প্রশ্নে মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে।

দিনে দিনে দিন কেটে গেলো। দুর্ভাগ্যের পেষণ সয়ে সয়ে, কাশ্মীরের মুসলিম সম্প্রদায় কাটিয়া দিলো সুদীর্ঘ তিনটি বছর। এলো ১৯৬২ সাল। চীন ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হলো। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাভেরাল হ্যারিম্যান ও বৃটেনের ডান্‌কান্‌ স্যাণ্ডস্‌ ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে প্রচেষ্টা চালালেন। এতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের সাথে আলোচনা করতে রাজী হন। এরই ফল-শ্রুতিতে ১৯৬২ সালের ৩০শে নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডি ও নয়াদিল্লী থেকে নিম্নলিখিত যুক্ত ইশতেহার প্রকাশ করা হয় ঃ

[ক] পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধান-মন্ত্রী একমত হয়েছেন যে, কাশ্মীর ও অন্যান্য বিষয়ে দুই দেশের মধ্যকার বর্তমান বিরোধসমূহের সমাধানের জন্য আবার প্রচেষ্টা গ্রহণ

করা উচিত ; যাতে ভারত ও পাকিস্তান শান্তি ও বন্ধুত্ব সহকারে পাশাপাশি থাকতে পারে।

[খ] ফলে, তাঁরা একটা সম্মানজনক ও ন্যায় সঙ্গত সমাধানে পৌঁছার জন্য শীঘ্রই আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

[গ] এগুলো প্রাথমিকভাবে মন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। উপযুক্ত সময়ে মিঃ নেহেরু ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মধ্যে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

এই মতৈক্যের ফলে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৩ সালের মে মাস অবধি মন্ত্রী পর্যায়ে ছয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু আলোচনা তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে, যখন উভয়ের সদিচ্ছা থাকে কোনো একটি মতনৈক্যে পৌঁছার জন্য। দড়ির একটা অংশ শতো পেঁচালেও তা দিয়ে অন্য দড়ির সঙ্গে গিরো দেয়া সম্ভব হয় না, যদি কিনা অপর পক্ষ না পেঁচিয়ে বার বার সরে থাকে। ফলে এই ছয় দফার সমস্ত আলোচনাই নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। জেগে জেগে ঘুমানো ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গাবে কে ? ভারত যতো কথাই বললো, তার মাঝে সে তার পূর্বের মতলব ও স্বার্থ থেকে একবিন্দুও সরে দাঁড়ালো না।

ছয় দফা আলোচনাকে ব্যর্থ করলো ভারত ঃ

১৯৬২ সালের মে মাস থেকে ১৯৬৩ সালের মে মাস অবধি, এই নীরেট এক বছরে যে ছয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, তার মাঝে ঘুরে ফিরে ভারত একই কথা বলে গেলো—যার কাব্যিক উপমা হলো :

"তোরা যে যা বলিস ভাই—
আমার সোনার হরিণ চাই।"

ভারতের প্রধান বুলি একটাই, কাশ্মীর থেকে সে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে কোনো অবস্থাতেই হটাবে না। কারণ, কাশ্মীর নাকি ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহলে ভারত কি কারণে বৈঠকে বসলো ? কি কাজে রাজী আছে সে ? সে শুধু রাজী যুদ্ধ-বিরতি রেখা বরাবর অতিসামান্য রদবদলের ব্যাপারে। অর্থাৎ এই ছয় দফা আলোচনাকেও ব্যর্থ করলো ভারত।

ভারতের এই অদমনীয় লিপ্সা, জেদ ও ইচ্ছাকে লক্ষ্য করে, এই হতাশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার পর পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল উক্ত আলোচনার ষষ্ঠ দফা ভেঙ্গে দিতে এবং সম্পূর্ণ আলোচনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

সুধী পাঠক, লক্ষ্য করুন, কিভাবে ভারত একটি স্বাধীনতা-প্রিয়, সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে তার তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত নখরযুক্ত থাবার মধ্যে নিয়ে গেলো। এ যেনো একটি অজগরের বহু সময়ের লক্ষ্য ভেদ—একটি নীরিহ ছাগলছানার ঘাড় মট্‌কে ধরা এবং ধীরে ধীরে অতি-কৌশলে তাকে নিজের পেটের মধ্যে চালান করে দেয়া।

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের এই আগ্রাসন-নীতি, পররাজ্য লোলুপ তস্করের নগ্ন চেহারা আজ বাংলাদেশী জনগণের চিনে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ কাশ্মীরও ছিলো বাংলাদেশের মতোই একটি মুসলিম প্রধান দেশ—যে তার স্বাধীকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না—পার্শ্ববর্তী মুসলিম শক্তি পাকিস্তানের সাহায্য পেয়েও। আজ বাংলা-দেশের হাল্‌ কি ? কেনো বাংলাদেশ থেকে কয়েকটি জেলাকে তারা

বিচ্ছিন্ন করে, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠন করতে চায়? এবং এই বঙ্গভূমি তৈরীর পেছনে কার, কি কি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এ বঙ্গভূমিটা মূলতঃ কার তাবেদার; তা আজ বাংলাদেশী জনগণকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে এবং চিন্তা করে, সেইমতো পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি নজরুল হয়তো কোনোদিন বিদায় নেবো এই দেশ ও পৃথিবী থেকে কিন্তু থেকে যাবে এই দলিল, তথ্যাবলী ও ইতিহাস, যে ইতিহাস থেকে দেশবাসীকে বার বার শিক্ষা নিতে হয়।

যাক এ অপ্রাসঙ্গিক কথা। আসুন, এবারে আমরা দেখি, জাতিসংঘ কাশ্মীর সমস্যার কতোটুকু সমাধান দিতে পারলো, উত্থাপিত প্রস্তাবের কতোটা সুরাহা করলো।

১৪

জাতিসংঘে কাশ্মীর সমস্যা।

পাকিস্তান শুরু থেকেই জাতিসংঘের প্রতি, তথা কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতি শ্রদ্ধাভাব পোশন করে আসছে। তার প্রমান কেবল এই বইতে উদ্ধৃত তথ্যাবলীতেই নাই—তার প্রমান রয়েছে জাতিসংঘের নথিপত্রেও। জাতিসংঘের ব্যাপারে পাকিস্তানী শুভ উদ্যোগসমূহ—বলতে গেলে, এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা-লগ্ন থেকেই বা কাশ্মীর সমস্যার শুরু থেকেই নেয়া হয়েছিলো।

প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলীর চিঠি ঃ

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই ভারতের নিষ্ক্রিয় ও নিরাসক্ত মনোভাব লক্ষ্য করে, সরাসরি আলোচনার জন্য, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ভারতীয় বিকল্পের কাছে ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির একাংশে লিয়াকত আলী খান দুঃখ প্রকাশ করে, লেখেন ঃ

> "......আপনার মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়টিকে জাতিসংঘে উত্থাপন করা ছাড়া এর শান্তিপূর্ণ সমাধানের আর কোনো উপায় আমি দেখছি না। এই প্রস্তাব করে ১৬ই নভেম্বর সংবাদপত্রে আমি যে বিবৃতি দিয়েছিলাম তার একটি অনুলিপি আপনার কাছে পাঠিয়েছি। আমি আশা করি, আপনি একমত হবেন যে, এটাই হচ্ছে

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায়।"

চিঠি প্রেরণের দু'দিন পরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবে এই উপায়ের কার্যকারীতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন—অর্থাৎ জাতিসংঘে এই সমস্যার সঠিক সমাধান হবে কিনা। বরং ভারতীয় প্রধান-মন্ত্রী জবাবে এই মত প্রকাশ করেন যে, কাশ্মীর ভারত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন ব্যবস্থাতেই রাজ্যের দাঙ্গা হাঙ্গামা দমন করতে সক্ষম (দাঙ্গা হাঙ্গামা বলতে চিঠিতে যা উল্লেখ ছিলো তাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুসলিম গণহত্যার কথাটিই বুঝাতে চেয়েছিলেন)। ভারত জবাবে আরো লিখলো, আমরাই (ভারতীয়রাই) তো কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

কিন্তু ভারতের এই জবাব থেকে লিয়াকত আলী খান যা বোঝার তা ঠিকই বুঝেছিলেন। শুরুতেই লিয়াকত আলী খান বুঝেছিলেন, গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ভারতের এই প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র বিশ্বমতকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই এবং বস্তুতঃ এই প্রতিশ্রুতি পালন করার কোনো সদিচ্ছাই ভারতের নেই।

ফলে, লিয়াকত আলী খান কয়েকদিন পরে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় এই বিরোধকে জাতিসংঘে উত্থাপন করার স্বপক্ষে তাঁর মতামত পুনঃ ব্যক্ত করেন।

নেহেরুর টেক্কাবাজী ঃ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিয়াকত আলী খানের তারবার্তা প্রেরণের একমাস পরে নেহেরু পাকিস্তানকে একটি জবাব লিখলেন। জবাবের চিঠিতে নেহেরু বললেন,

"এ ব্যাপারে জাতিসংঘ বিশেষ কিছু করতে পারবে-বলে আমি মনে করিনা।"

তিনি আরো লিখলেন ঃ

"এই বিরোধে পাকিস্তান একটিমাত্রই পক্ষ নয়, সুতরাং এই বিরোধ বিশ্ব সংস্থায় উত্থাপনের কোনো অধিকারই পাকিস্তানের নেই।"

লিয়াকত আলী খান লিখলেন ঃ

"আমার মতে পরিস্থিতির মৌলিক বাস্তবতার ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিকতামুলক ব্যবস্থার দ্বারাই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে। এবং পাকিস্তান এই বিরোধে একটামাত্র পক্ষ কিনা বা জাতিসংঘে এটা কেমন করে উত্থাপন করা যেতে পারে, তা সে চিন্তা করে দেখবে তবে তা সে এই ধরণের আইনগত বিতর্কের মাধ্যমে করবে না।"

পাকিস্তান, জাতিসংঘে বিষয়টি উত্থাপনের ব্যাপারে যখোন পন্থা-আবিস্কারে চিন্তা মগ্ন, ঠিক তখোন (অর্থাৎ লিয়াকত আলীর উক্ত জবাবের ১৫ দিনের মধ্যেই) নেহেরু পাকিস্তানকে টেক্কাদেয়ার জন্য জাতিসংঘে উল্টো ভারতের পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপন করে। সেই থেকেই বিষয়টি বিশ্ব-সংস্থায় জড়িয়ে পড়ে।

জাতিসংঘে ভারতের উল্টো বিবৃতি ঃ

পাকিস্তানের আগেই ভারতের নেহেরু জাতিসংঘে যে উল্টো অভিযোগ জানান, সেই অভিযোগের একাংশে বিবৃত করা হয় ঃ

কাশ্মীর রাজ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান দায়ী এবং এরফলে জম্মু ও কাশ্মীর বৈধভাবে ভারত যোগদান করেছে।

ভারত নিরাপত্তা পরিষদকে এই মর্মে অনুরোধ করেছিলো যে,

নিরাপত্তা পরিষদ যেন পাকিস্তানকে তার নাগরিক ও উপজাতিদের এই রাজ্যে প্রবেশ করা থেকে নিরস্ত করার এবং তাদেরকে যে কোনো প্রকার বাস্তব সাহায্য না দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। ভারত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, কাশ্মীর রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা পুনঃ স্থাপিত হওয়ার পরই জনসাধারনের মতামত যাচাই করার জন্য তারা রাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠান করবে।

পাকিস্তানের জবাব ঃ

ভারতের দেয়া উল্টো বিবৃতির জবাবে পাকিস্তান বলে,

যে সব পাকিস্তানী নাগরিক ও উপজাতি তাদের দুর্দশাগ্রস্থ ভাইদের সাহায্য করার জন্য কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের সবাইকে নিরস্ত্র করা পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্যই পাকিস্তান এসব ব্যক্তিকে কোনো প্রকার বাস্তব সাহায্য প্রদান করেনি ; যদিও বিদ্রোহীদের জন্য পাকিস্তানের সকল প্রকার নৈতিক সহানুভূতি রয়েছে।

১৫

কাশ্মীরকে অঙ্গরাজ্য হিসেবে ঘোষণার বৈধতার চ্যালেঞ্জ !

নেহেরু থেকে শুরু করে, ভারতীয় নেতাদের প্রায় সবাই বলতে থাকে 'কাশ্মীর হচ্ছে ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য। পাকিস্তান যখোন জাতিসংঘে ভারতের উল্টো বিবৃতির জবাব দিচ্ছিলো, তখোন সে কাশ্মীর কর্তৃক ভারতে যোগদানের প্রশ্নটিও উত্থাপন করে এবং এভাবে জম্মু ও কাশ্মীরকে জবর দখল করে রাখার পক্ষে ভারতীয় দাবীর মূল ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে।

পাকিস্তান বলে :

' এই সমস্যার একমাত্র বাস্তব সমাধান নিহিত রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কোন্ ডোমিনিয়নে যোগদান করা উচিত সেটা নির্দ্ধারনের উদ্দেশ্যে ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণ করা যায় এমন এক অবস্থা সৃষ্টির মধ্যে।"

পাকিস্তান বিশ্লেষণ করে বলে ঃ

"একটা ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠানের দু'টি মৌলিক শর্ত হচ্ছে,

(ক) রাজ্য থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা, এবং

(খ) এমন এক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যা কাশ্মীর রাজ্যের ভারত অথবা পাকিস্তানের পক্ষে যোগদানের প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকবে।

যদি এ সকল শর্ত পূর্ণকরা হয়, তাহলে পাকিস্তান অঙ্গীকার করছে যে, কাশ্মীর রাজ্য থেকে সরে আসার জন্য উপজাতিদের উপর ও যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আজাদ কাশ্মী-

রের উপর পাকিস্তান নৈতিক প্রভাব বিস্তার করবে ; এবং এভাবে জম্মু ও কাশ্মীর চূড়ান্তভাবে ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদান করবে কিনা তা' নির্ধারণের জন্য জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠান সম্ভব করে তুলবে।

নিরাপত্তা পরিষদ ভারতীয় দাবীর পৃষ্ঠপোষকতা করতে রাজী হননি এবং পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব পাশ করে।

মুসলিম নিধন-যজ্ঞ !

এরপর নিরাপত্তা পরিষদ যখন এই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, ঠিক তখোনই ভারত সরকার নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি (পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সক্ষম এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার)-এর প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে কাশ্মীর রাজ্যে এক ব্যাপক মুসলিম নিধন-যজ্ঞ শুরু করে।

এরফলে বিপুল সংখ্যক কাশ্মীরী মোহাজের পাকিস্তানে হিজরত করে এবং মঙ্গলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঝিলাম খাল হেড ওয়ার্কে ভীড় জমায়। ভারতের উদ্দেশ্য ছিলো রাজ্যের অভ্যন্তরে সমস্ত পতিরোধ ধ্বংস করে দেয়া এবং বিশ্বের সামনে একটা নিস্পন্নকার্য নিয়ে হাজির হওয়া ; যেমন তারা ইতিমধ্যেই করেছিলো জুনাগড়ের এবং হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রে—তাই এখানে করবার উপক্রম করছিলো। পাকিস্তানের সংহতির নিরাপত্তা বিধান করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের মে মাসের প্রথম দিকে—বিশেষ কয়েকটি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান দখলের জন্য এই রাজ্যে কিছু সংখ্যক সৈন্য পাঠাতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিলেন।

১৬

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত !

ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শ্রবনের পর, নিরাপত্তা পরিষদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বিরোধের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সমাধান হচ্ছে, জনসাধারণের স্বাধীনভাবে ব্যক্ত মতামতের ভিত্তিতে কাশ্মীর রাজ্যের যোগদান নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদ ভারত ও পাকিস্তানের জন্য এক জাতিসংঘ কমিশন নিয়োগ করেন।

আলোচনার ফল স্বরূপ, কমিশন ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট ও ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারী দু'টি প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সম্মতি এবং নিরাপত্তা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করতে সক্ষম হয়। এই দুটি প্রস্তাব হচ্ছে সেই আন্তর্জাতিক চুক্তির অঙ্গ যা জম্মু ও কাশ্মীররের অন্তর্ভুক্তি প্রশ্নে ভারত, পাকিস্তান ও জাতিসংঘকে আবদ্ধ করে রেখেছে। [এই বইটির শেষ দিকে 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ের ১নং স্থানে সেই আন্তর্জাতিক চুক্তিটা হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে]

এখানে দেখুন, মূল অংশটুকু—অর্থাৎ একত্রিভূত করে দেখলে এই প্রস্তাবগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সমূহ দেখা যাবে। যেমন—

(১) যুদ্ধ-বিরতি : যুদ্ধ-বিরতির হুকুম দান এবং যুদ্ধ-বিরতি রেখা চিহ্নিত করণ ;

(২) সন্ধি-চুক্তি : জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ; এবং

(৩) গণভোট : জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্ন নিরূপণের জন্য জাতিসংঘের পরিচালনায় অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠান।

এই চুক্তি অনুসারে ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী রাজ্যে সংঘর্ষ বন্ধ হয় এবং ১৯৪৯ সালের ২৭শে জুলাই যুদ্ধ-বিরতি রেখা চিহ্নিত করে দেয়া হয় এবং এর ৫০ মাইল দৈর্ঘ্যে ৪৫ জন জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে চুক্তির প্রথম অংশ প্রতিপালিত হয়।

এই চুক্তির দ্বিতীয় অংশে গণভোটের প্রস্তুতি হিসাবে রাজ্য থেকে সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা ছিল। বাধা ও বলপ্রয়োগের শিকার না হয়ে কাশ্মীরী জনসাধারণ নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এমন একটি মুক্ত ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠান সৈন্য অপসারণ ব্যতিরেকে সম্ভব ছিল না।

চুক্তির দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি দেখা গিয়েছিল। এমনকি একটা সন্ধি চুক্তির অপেক্ষা না করেই পাকিস্তান এগিয়ে গিয়েছিল : যে সকল উপজাতি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজ্যে প্রবেশ করেছিল পাকিস্তান তাদের অপসারণ কার্যে পরিণত করেছিল। তারপর উভয় পক্ষই গণভোট পরিচালক হিসাবে অ্যাডমিরাল চেষ্টার ডব্লিউ নিমিৎসের নিয়োগে সম্মতি প্রদান করেছিল। কিন্তু ভারত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে সাথে তার সেনাবাহিনী অপসারণ অস্বীকার করলে এর অগ্রগতি রূদ্ধ হয়ে যায়। সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ ও তার বহু প্রতিনিধির প্রচেষ্টা এরপর থেকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরে ভারত এমন কি তার গণভোট অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিও অস্বীকার করে।

বিভিন্ন সময়ে যে-সকল প্রস্তাব করা হয়েছে এবং যেগুলি পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত ও ভারত কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েছে সেগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

জাতিসংঘের পাক-ভারত (UNCIP) কমিশনের প্রস্তাব :

(১) ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাক-ভারত জাতিসংঘ কমিশন দুই পক্ষের এক বৈঠক আহ্বান করেন। আনসিপের ১৮৪৮ সালের ১৩ই আগষ্টের সিদ্ধান্তে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজ নিজ প্রস্তাব আলোচনা করার জন্য দুইপক্ষকে বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। পাকিস্তান এতে সাড়া দেয় এবং এমন একটা কাঠামোর প্রস্তাব করে, মতৈক্য সাপেক্ষে, যার মধ্যে থেকে উভয় সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষগণ একযোগে একটা বিস্তারিত সৈন্য অপসারণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। পাকিস্তান আরও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে তিন মাসের মধ্যে প্রত্যাহার করা হবে। যুক্ত আলোচনা ও মতৈক্যের জন্য তবুও ভারত কোন পরিকল্পনা পেশ করেনি।

এই মূল অস্বীকৃতিই বিভিন্নরূপে এবং বিভিন্ন কৃত্রিম কারণে আজ পর্যন্ত বজায় রয়েছে।

মধ্যস্থতা প্রস্তাব :

(২) একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ভারত কর্তৃক যে কোন অনুক্রম ও ধরণের সৈন্য প্রত্যাহারে ভারতের অস্বীকৃতি প্রথমে আনসিপের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট ও ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাবসমূহের বিশ্লেষণের ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। তদনুসারে আনসিপ

১৯৪৯ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে প্রস্তাব করে যে, 'দুই সরকারকে' ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্টের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সম্পর্কে তাদের উথাপিত সকল প্রশ্নের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে সকল মতানৈক্য রয়েছে সেগুলিকে শালিশে পেশ করতে হবে। মধ্যস্থ নিরপেক্ষভাবে এগুলির বিচার করবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে', এবং গণভোট পরিচালক হিসাবে মনোনীত অ্যাডমিরাল নিমিৎস্ মধ্যস্থের কাজ করবেন। ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান ও যুক্তরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী এক প্রকাশ্য আবেদনে এই প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

পাকিস্তান এই ব্যবস্থা গ্রহণে রাজি হয় ; ভারত এটা প্রত্যাখান করে।

ম্যাক্নটন্ প্রস্তাব ঃ

(৩) উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনে আনসিপের ব্যর্থতার পরে নিরাপত্তা পরিষদ তার সভাপতি কানাডার জেনারেল ম্যাক্‌নটন্‌কে কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য একটা পারস্পরিক ভাবে সন্তোষজনক ভিত্তি খুঁজে বের করার সম্ভাবনা দুই সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুরোধ করে। রাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৈন্য অপসারণের জন্য জেনারেল ম্যাক্‌নটন্‌ কয়েকটি প্রস্তাব তৈরী করেন।

পাকিস্তান এ সকল প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু ভারত তথাকথিত সংশোধনীর আকারে এগুলি সম্পর্কে তার আপত্তিসমূহ উথাপন করে (এটা স্পষ্ট প্রত্যাখানের শামিল)। সে সকল সংশোধনী এ সকল প্রস্তাবের সাথে খাপ খায় না এমন একটি স্কীম এগুলির বদলে খাড়া করে।

নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বান ঃ

(৪) জাতিসংঘের প্রতিনিধি স্যার ওয়েন ডিক্সনের – যিনি আনসিপের উত্তরাধিকারী—প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারত কর্তৃক সৃষ্ট অচলাবস্থা চলতে থাকায় নিরাপত্তা পরিষদ তার ১৯৫১ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে গৃহীত প্রস্তাবে সকল মতানৈক্যের ব্যাপারে উভয় পক্ষকে মধ্যস্থতা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

স্যার ওয়েন ডিক্সনের প্রচেষ্টা ঃ

(৫) জেনারেল ম্যাক্‌নটনের প্রচেষ্টা শেষ হলে 'সৈন্য অপসারণ কর্মসূচী রচনা ও তত্ত্বাবধানের কাজে সহায়তা করার জন্য' এবং 'বিরোধের তড়িৎ ও স্থায়ী সমাধানের সহায়তা করতে পারে এমন পরামর্শ' দানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ স্যার ওয়েন ডিক্সনকে জাতিসংঘের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন। ভারতীয় আপত্তির মোকাবেলা করার জন্য স্যার ওয়েন ডিক্সন প্রস্তাব করলেন যে, 'সৈন্য অপসারণের প্রথম ব্যবস্থা হবে পাকিস্তান কর্তৃক একটা নির্দিষ্ট দিন থেকে নিয়মিত সৈন্য প্রত্যাহার' এবং 'এই নির্দিষ্ট দিনের কিছু দিন পর যুদ্ধ-বিরতি রেখার উভয় পার্শ্বে অন্যান্য ব্যবস্থা যতদুর সম্ভব একত্রে চলতে থাকবে।

পাকিস্তান এই প্রস্তাব গ্রহণ করে, ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে।

(৬) ১৯৫০ সালের ২০শে জুলাই তারিখে স্যার ওয়েন ডিক্সন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে ব্যাপক আলোচনা কালে সম্পূর্ণ রাজ্যটিকে একটি শাসন ব্যবস্থার এক্তিয়ারভুক্ত করার জন্য জাতিসংঘ প্রতিনিধি তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই শাসন ব্যবস্থা যৌথভাবে নিরপেক্ষ হবে, এবং এভাবে গণভোট অনুষ্ঠান কালেই

একটা রাজনৈতিক সীমা হিসাবে যুদ্ধ-বিরতি রেখার দ্বারা রাজ্যের বিভক্তির ফলে সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ দূর করার কাজে নিয়োজিত হবে। সমগ্র রাজ্যের জন্য এই একক সরকার ভারত কর্তৃক প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থা ও আজাদ কাশ্মীর আন্দোলনের কোয়ালিশনে গঠিত হবে। এই কোয়ালিশনে রাজনীতির আওতাবহির্ভূত উচ্চপদস্থ আইন বিভাগীয় কিম্বা শাসন বিভাগীয় কর্মচারী হবেন এবং তাঁরা সর্বসাধারণের আস্থা ভাজন হবেন। অথবা তাঁরা জাতিসংঘের প্রতিনিধি হবেন, "এ সকল প্রস্তাবনার কোনটিই ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর মনঃপূত হয়নি", স্যার ওয়েন ডিক্সন জানিয়েছেন। সৈন্য অপসারণ ও গণভোট অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যে কোন ন্যায়সঙ্গত পরিকল্পনায় ভারতের সম্মতি আদায়ের সকল প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলে স্যার ওয়েন ডিক্সন 'কাশ্মীর উপত্যকা নিয়ে গঠিত অথবা কাশ্মীর উপত্যকাসহ একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আংশিক গণভোট গ্রহণ এবং রাজ্যের বাকী অংশকে ভাগ করা' সহ অন্যান্য সমাধানের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করে দেখলেন। পাকিস্তান কর্তৃক এই পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখার পর এবং সামগ্রিক গণভোটের ক্ষেত্রে 'তার অবস্থানের কোন মূল্যহীন বা ক্ষতি হবে না', এই আশ্বাস পাওয়ার পর পাকিস্তান এই পরিকল্পনা পরীক্ষাকল্পে একটা বৈঠকে যোগদানে সম্মতি প্রকাশ করে। এমন কি পাকিস্তানের এই ইচ্ছা প্রকাশ সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে এই বিরোধের মীমাংসার পথে ভারত কর্তৃক সৃষ্ট বাধা অপসারিত হয়নি। 'গণভোটের নিরপেক্ষতার এবং বলপ্রয়োগের ভয় থেকে এর মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য' জাতিসংঘ প্রতিনিধি তাঁর পরিকল্পনায় যে সকল প্রস্তাব করেছিলেন ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী তাতে প্রবল অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

ডঃ গ্রাহামের প্রস্তাবসমূহ ঃ

(৭) আজাদ ফৌজের নিরস্ত্রীকরণ ও বিয়োজনের ব্যাপারে ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য জাতিসংঘ প্রতিনিধি ডঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম, যিনি স্যার ওয়েন ডিক্সনের উত্তরাধিকারী ছিলেন, সৈন্য অপসারণের দু'টি পর্যায় প্রস্তাব করেন—একটি যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কিত এবং একটি গণভোট সম্পর্কিত। এই দু'টি পর্যায়কে তিনি 'একটা একক ধারাবাহিক কার্য পদ্ধতি'তে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। এর অর্থ হচ্ছে, এই পদ্ধতির শেষে সৈন্য অপসারণ অবশ্যই সম্পূর্ণ হতে হবে—শুধু ব্যবস্থাগত ভাবে নয়, বস্তুগত ভাবেও। একদিকে যেমন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে অবশ্যই অপসারণ এবং আজাদ ফৌজকে অবশ্যই নিরস্ত্র করে ভেঙ্গে দিতে হবে, অন্য দিকে তেমনই ভারতীয় বাহিনীর বেশীর ভাগ সৈন্য অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে এবং পরে বাকী ভারতীয় সৈন্যের ব্যাপক হ্রাস অবশ্যই করতে হবে; এবং মহারাজার সেনাবাহিনীও মিলিশিয়াকে অবশ্যই নিরস্ত্র করে ভেঙ্গে দিতে হবে। এই 'একক ধারাবাহিক পদ্ধতি' বাস্তবায়নের অর্থ হচ্ছে বিদেশী সৈন্যের সম্পূর্ণ অপসারণ, স্থানীয় ফৌজের নিরস্ত্রীকরণ ও বিয়োজন এবং তাদের স্থানে উভয় দিকে বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ। পাকিস্তান এই ভিত্তিতে এ কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সৈন্য অপসারণের এমন একটা পদ্ধতিতে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে যার ফলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিরতি রেখার উভয় দিকে চার ব্যাটেলিয়ান করে পদাতিক সৈন্যের বেশী থাকবে না। আপাত দৃষ্টিতে ভারত এই কর্মসূচীতে সম্মতি প্রদান করলেও প্রথমতঃ তার বাকী সৈন্য ও স্বীয় পক্ষের স্থানীয় ফৌজের অপসারণ এবং দ্বিতীয়তঃ, সৈন্য অপসারণের পরে গণভোট পরিচালকের নিয়োগকে এর আওতাবহির্ভূত রেখে কার্যতঃ এই কর্মসূচী প্রত্যাখ্যান করে।

৬—

(৮) জাতিসংঘের প্রতিনিধি তাঁর ১৯৫১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবে সৈন্য অপসারণের যে কর্মসূচী পেশ করেন তা নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ১৯৫১ সালের ১০ই নভেম্বর অনুমোদিত হয়। সৈন্য অপসারণের জন্য নির্ধারিত সময় শেষে যুদ্ধ-বিরতি রেখার দুইধারে সৈন্য মোতায়েনের সর্বনিম্ন সংখ্যা সম্পর্কে এবং গণভোট পরিচালকের নিযুক্তি সম্পর্কে উভয় পক্ষের সম্মতি আদায়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে ডঃ গ্রাহাম উভয় পক্ষের কাছে এই নীতি আবার উল্লেখ করলেন যে, "সৈন্য অপসারণের মেয়াদের শেষে অবস্থানরত সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যাকে হ্রাস করে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনয়ন করতে হবে, যাতে গণভোট পরিচালক এদের চূড়ান্ত অপসারণ সমাধা করতে পারেন।" পাকিস্তান শুধু এই নীতি গ্রহণ করেনি বরং প্রস্তাব করে যে, এই চুক্তিতে এমন একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে যার ফলে চুক্তির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে তা' জাতিসংঘের প্রতিনিধির কাছে উত্থাপন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু যেখানে ভারত সৈন্য অপসারণ কর্মসূচীর সমাপ্তির পরে তার দিকে ২৮,০০০ সৈন্যের বাহিনী ও ৬,০০০ মিলিশিয়া রাখার জন্য জেদ প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে সে দাবী করে যে, আজাদ কাশ্মীরে ৪,০০০ লোকের এক পুলিশ বাহিনীর বেশী থাকতে পারবে না এবং এর অর্ধেক সশস্ত্র ব্যক্তি ও অর্ধেক আজাদ কাশ্মীরের অনুসারী হবে। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহায়তায় জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হতে হবে।

সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ ঃ

(৯) ভারতীয় একগুয়েমির ফলে সৃষ্ট সৈন্য অপসারণ সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৫২ সালের ১৬ই জুলাই ও ২রা সেপ্টেম্বর ডঃ গ্রাহাম

সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন। এগুলিতে তিনি যুদ্ধ-বিরতি রেখায় পাকিস্তানের দিকে সর্বনিম্ন ৬,০০০ সৈন্য ও ভারতের দিকে ১৮,০০০ সৈন্য অথবা পাকিস্তানের দিকে ৩,০০০ থেকে ৬,০০০ এবং ভারতের দিকে ১২,০০০ থেকে ১৮,০০০ সৈন্য মোতায়েন রাখার প্রস্তাব করেন। পাকিস্তান উপলব্ধি করল যে এই প্রস্তাব অনুসারে রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য থেকে যাবে। এই উপলব্ধি সাপেক্ষে জাতিসংঘ প্রতিনিধির সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে বলে পাকিস্তান নিজে থেকে ঘোষণা করল। অপর পক্ষে ভারত দাবী করল যে, "সৈন্যের সর্বনিম্ন সংখ্যা কোন মতে ২১,০০০ থেকে হ্রাস করা যাবে না।" ভারতীয় পক্ষের মিলিশিয়াকে কোন অবস্থাতেই এই হিসাবের মধ্যে ধরা যাবে না এবং কেবল মাত্র 'আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও বিয়োজন করা হলেই' ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করে এই সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনয়ন করা হবে; এবং গণভোট পরিচালক আর কোন মতেই ভারতীয় সৈন্যের অপসারণ কিংবা হ্রাসের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না। এই একগুয়েমি মনোভাব এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ঃ

অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই সমস্যা ১৯৫২ সালের শেষ দিকে আবার নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়। ডঃ গ্রাহামের প্রস্তাবিত সৈন্য-সীমা ১৯৫২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে অনুমোদিত হয়।

ভারত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি; কিন্তু পাকিস্তান ঘোষণা করে যে, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পাকিস্তান রাজী আছে। জাতিসংঘ প্রতিনিধি মন্তব্য করেন ঃ

...এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, পাকিস্তান সরকার নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৫২ সালের ২৩শে ডিসেম্বরের প্রস্তাব মেনে নিতে এবং এর ভিত্তিতে অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ করতে রাজী ছিল। কিন্তু ভারত সরকার আবার আলোচনা শুরু করার ভিত্তি হিসাবে এই প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষম থেকে গেল।

গানার জারিং

(১০) যখন নিরাপত্তা পরিষদ তার ১৯৫৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তাবে পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি, সুইডেনের দূত গানার জারিংকে 'নিরাপত্তা পরিষদ ও আনসিপের পূর্বতন প্রস্তাবসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে, তার মতে বিরোধের মীমাংসায় সহায়তা করতে পারে' এমন কোন প্রস্তাব দুই সরকারের সাথে পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুরোধ করে, ভারত দাবী করে যে, আনসিপের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাবের প্রথম অংশ (যুদ্ধ-বিরতি, রাজ্যে উভয় বাহিনীর সামরিক বৃদ্ধি না করা এবং একটা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্পর্কিত) পাকিস্তান কার্যকরী করেনি সুতরাং প্রস্তাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এখনও আসেনি। মিঃ জারিং তারপরে প্রস্তাব করেন:

প্রথম অংশ সম্পর্কে অচলাবস্থার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আমি দুই সরকারের কাছে জানতে চাইলাম যে, প্রথম অংশ বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা এই প্রশ্নে মধ্যস্থতা মেনে নিতে তাঁরা রাজী হবেন কিনা। দুই সরকারের কাছে আমার প্রস্তাবে শুধু মধ্যস্থতাই বিবেচিত হয়নি, বরং মধ্যস্থ বা মধ্যস্থগণ যদি দেখতে পান যে বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তাহলে সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে উভয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের থাকবে। আরও বিবেচনা করা হয়েছিল যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে

মধ্যস্থগণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বিচার করে দেখবেন তাঁদের নির্দেশসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা।

সামগ্রিকভাবে কাশ্মীর সমস্যার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার প্রশ্নে ভারত সরকারের নেতিবাচক মনোভাব সম্পর্কে সজাগ থেকে আমি তাঁদের কাছে বিশ্লেষণ করেছিলাম যে, আমি ঐ ধরনের কোন কিছুর প্রস্তাব করছি না, এবং আমি যা' প্রস্তাব করছি তাকে মধ্যস্থতা নাম দিলেও সম্ভবতঃ তা' একটা নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা ধরনের হবে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সাধারণভাবে পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতি সাধন করতে পারতো। আমি নিশ্চিত যে, এ ধরনের পরিস্থিতি উভয় দেশের কাছেই অপ্রিয় হতো না।"

পাকিস্তান এই প্রস্তাব গ্রহণ করে; ভারত তা' প্রত্যাখ্যান করে।

আবার ডঃ গ্রাহাম: পাঁচটি প্রস্তাব:

(১১) অ্যাম্বেসেডার গানার জারিং-এর মিশনের ব্যর্থতার পরে নিরাপত্তা পরিষদ তার ১৯৫৭ সালের ২রা ডিসেম্বরের প্রস্তাবে জাতিসংঘ প্রতিনিধি ডঃ গ্রাহামকে 'আনসিপের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট ও ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাবসমূহের বাস্তবায়ন এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে অধিকতর উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছে যে-কোন সুপারিশ করতে আবার অনুরোধ করে'। বিরোধ হাল্কা করার জন্য ডঃ গ্রাহাম নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

(ক) উভয় পক্ষ কর্তৃক শান্তি ঘোষণা। বিশেষ করে তিনি প্রস্তাব করেন যে, দুই সরকার নূতন করে এই মর্মে ঘোষণা করবে যে, পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে এমন কোন বিবৃতি দান এবং কার্য

থেকে তারা নিরস্ত থাকবে এবং এই ঘোষণায় তারা তাদের জনসাধারণের কাছে আলোচনা অনুষ্ঠানের পক্ষে সহায়ক এমন পরিবেশ সৃষ্টির কাজে সাহায্য করার আবেদন করবে।

(খ) আবার যুদ্ধ-বিরতি রেখার অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা ঘোষণা করা।

(গ) কাশ্মীরের যে অংশ থেকে পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহৃত হবে সে অংশ থেকে পাকিস্তানী সৈন্য অপসারণের পর তার শাসন-ব্যবস্থা কি হবে তা অবিলম্বে পর্যালোচনা করে দেখা এবং পাকিস্তানের সৈন্য অপসারণের পর জম্মু ও কাশ্মীরের পাকিস্তানী অংশের সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানের জন্য জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা।

(ঘ) উভয় সরকার কর্তৃক গৃহীত আনসিপ প্রস্তাবসমূহে গণভোট সম্পর্কে প্রস্তাবিত বাস্তব ব্যবস্থাসমূহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা।

(ঙ) জাতিসংঘ প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠান করা।

পাকিস্তান পাঁচটি প্রস্তাবেই সম্মতি প্রকাশ করে। একথা ডঃ গ্রাহামের রিপোর্টের ২১ থেকে ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। তাঁর রিপোর্টের ২৭ থেকে ৩৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারত এ সকল প্রস্তাবের প্রত্যেকটিই প্রত্যাখ্যান করে। ডঃ গ্রাহামের সুপারিশসমূহ প্রত্যাখ্যানের পক্ষে ভারতের যুক্তিসমূহ বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এগুলোই হচ্ছে সাধারণভাবে এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে সৈন্য অপসারণের একটা বাস্তব পরিকল্পনার প্রতি ভারতের সুনির্দিষ্ট সম্মতি আদায়ের জন্য জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের মূল প্রচেষ্টা।

১৭

নিরাপত্তা পরিষদ, ১৯৬২ সাল

১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে পেশকৃত ডঃ গ্রাহামের ষষ্ঠ রিপোর্ট নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ১৯৬২ সালে বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়। পাকিস্তান, ভারত ও অন্য কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের বিবৃতিদানের পর পরিষদের একজন সদস্য, আয়ারল্যাণ্ড নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন।

আয়ারল্যাণ্ডের পাঁচটি প্রস্তাব :

নিরাপত্তা পরিষদ পাক-ভারত প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শ্রবণ করবার পর ;

জাতিসংঘের প্রতিনিধি ডঃ এফ্‌ গ্রাহামের রিপোর্ট বিবেচনা করার পর ;

এই সমস্যা সমাধানে দুই পক্ষের সরকার বল প্রয়োগের সাহায্য গ্রহণ করবে না বলে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলি লক্ষ্য করে ;

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে এই প্রশ্নে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জনে সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘ সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থেকে ।

(১) তার ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারীর প্রস্তাব এবং ভারত ও পাকিস্তানের জন্য, জাতিসংঘ কমিশনের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্টের ও ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত নীতিসমূহ উভয় পক্ষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

(২) জাতিসংঘ সনদের ৩৩নং ধারা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা অনুসারে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে যত শীঘ্র আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

(৩) আলোচনা উৎসাহিত করার পক্ষে সহায়ক এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দুই সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

(৪) অবস্থা জটিল করে তুলতে পারে এমন কোন বিবৃতি দান অথবা ব্যবস্থাবলম্বন থেকে বিরত থাকার জন্য ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(৫) প্রস্তাবের শর্ত পালনের উদ্দেশ্যে উভয় সরকারের অনুরোধ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করছে।

দেখা যাবে যে, এ প্রস্তাবটিতেও নিরাপত্তা পরিষদ এবং আনসিপের পূর্ববর্তী প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনার কথাই বিবেচনা করা হয়েছিল। আয়ারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, চিলি, ভেনিজুয়েলা ও জাতীয় চীন যে ক্ষেত্রে প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়; ঘানা ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সে ক্ষেত্রে ভোটদানে বিরত থাকে, আর রুমানিয়া ও সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে ভোট দান করে। এমনি ভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন কার্যতঃ এই বিস্ফোরণমুখ সমস্যাটি সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের আর একটি বাস্তব প্রচেষ্টাকেই বানচাল করে দেয়।

মিত্রভাবাপন্ন দেশসমূহের প্রচেষ্টা ঃ

কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘের আওতাধীনে এ-সব ব্যাপক প্রচেষ্টার সংগে সংগে পাকিস্তান এবং ভারত উভয় দেশের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন কয়েকটি সরকারও তাদের সাহায্য করার প্রয়াস পায়। এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সমধিক উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে আনসিপ প্রস্তাব করে যে, তার ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশের বাস্তবায়নের ব্যাপারে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে-সব অনৈক্য রয়েছে তা প্রস্তাবিত গণভোট পরিচালক এ্যাডমিরাল নিমিৎস্-এর সালিশীতে অর্পণ করা হোক। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী প্রদত্ত এক সরকারী আবেদনে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

পাকিস্তান এই প্রস্তাব মেনে নেয়; ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে।

(২) ১৯৫১ সালের জানুয়ারীতে কমনওয়েলথ্ প্রধান মন্ত্রিবৃন্দ প্রস্তাব করেন যে, গণভোটের আগে এবং গণভোট চলাকালীন কাশ্মীর থেকে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের সৈন্য বাহিনী অপসারণ করে তার জায়গায় অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড থেকে নিরপেক্ষ বাহিনী মোতায়েন করা হোক।

পাকিস্তান রাজী হয়, ভারত হয় না।

(৩) ভারতের এই প্রত্যাখ্যানের পর কমনওয়েলথ্ প্রধান মন্ত্রিগণ প্রস্তাব করেন যে, কাশ্মীরে পাকিস্তান ও ভারতীয় লোক নিয়ে গঠিত এমন একটি মাত্র পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হোক যা নাকি যৌথভাবে নিরপেক্ষ থাকতে পারে এবং গণভোটের পক্ষপাতহীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।

পাকিস্তান প্রস্তাবটি গ্রহণ করে ; ভারত প্রত্যাখ্যান করে।

(৪) অতঃপর কমনওয়েলথ্ প্রধানমন্ত্রিগণ এই মর্মে আর একটি তৃতীয় প্রস্তাব প্রদান করেন যে, গণভোটের সময় ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের বাহিনী সরিয়ে নিয়ে তদস্থলে গণভোট পরিচালক কর্তৃক গঠিত একটি স্থানীয় বাহিনী নিয়োগ করা হোক।

পাকিস্তান প্রস্তাবটি মেনে নেয় ; ভারত প্রত্যাখ্যান করে।

(৫) ১৯৫১ সালের মার্চে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত এবং স্বস্তি পরিষদের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মিউনিস্ প্রস্তাব করেন যে, সমস্ত বিতর্কিত বিষয় সালিশীতে অর্পণ করা হোক এবং দুই পক্ষই তার রায় মেনে নেবে।

পাকিস্তান প্রস্তাবটি মেনে নেয়, ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে।

(৬) ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ জন এফ. কেনেডী পাকিস্তান ও ভারতের কাছে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউজিন ব্ল্যাকের মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেন। ভারত কর্তৃক প্রস্তাবটি সংগে সংগে প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৮
আবার জাতিসংঘ

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে জাতিসংঘ আবার কর্মতৎপর হয়ে উঠে। ভারত তার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার এপারে সঞ্চালিত করে এবং আজাদ কাশ্মীরের মূল ভূখণ্ডের কয়েকটি ফাঁড়ি দখল করে নেয়, এবং অপর কয়েকটিতে গোলা বর্ষণ করে। এমন কি পাকিস্তানের গুজরাট জেলার একটি গ্রামেও তারা গোলা বর্ষণ করে।

এই পরিস্থিতির উপর নিরাপত্তা পরিষদ প্রদত্ত তাঁর প্রাথমিক রিপোর্টে সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে মুক্তি যুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় মতবাদ অনুসরণ করলেও যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা লংঘন এবং সীমান্তের এপারে ফাঁড়ি দখলের প্রশ্নে আসল জায়গায় দোষ চাপাতে তিনি কোন ভুল করেননি। ১৯৬৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরী বৈঠকে উ থান্ট উভয় পক্ষের প্রতি এক পাঁচ-দফা আবেদন জানান। তিনি তাঁর আবেদনে কাশ্মীরে অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি, যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা বরাবর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের চলাচলের স্বাধীনতা ও প্রবেশাধিকার দানের অনুরোধ জানান। তাতে সংঘর্ষের মূল অর্থাৎ খোদ কাশ্মীর সমস্যার কোন উল্লেখ ছিল না।

যা হোক, পাকিস্তানের উপর পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ চালিয়েই ভারত এই আবেদনে সাড়া দেয়। কাশ্মীরে তাকে যে পাল্টা আক্রমণের মোকাবিলা

করতে হয় তাতে ভীত হয়ে প্রথমে সে লাহোরে আন্তর্জাতিক সীমারেখা লংঘন করে এবং তার পর পরই অতি দ্রুত আরও দুটি ফ্রন্ট খোলে, একটি শিয়ালকোটে এবং অপরটি সুদূর দক্ষিণে গাড্রোতে।

নিরাপত্তা পরিষদ মনে করল এবার কিছু একটা করা দরকার। তদনুযায়ী তার একটা জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো এবং তাতে এক প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে উভয়-পক্ষকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সাবেক অবস্থানে ফিরিয়ে নেবার আহ্বান জানানো হলো। নিরাপত্তা পরিষদ সেক্রেটারী জেনারেলকেও উপদেশ দেয় যে, তিনি যেন উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুই দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আপোষ আলোচনা চালান। তদনুযায়ী মিঃ উ-থান্ট ১৯৬৫ সালের ৯ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারত সফর করলেন।

পাকিস্তান সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট যে মতামত ব্যক্ত করে তা হলো এই যে যুদ্ধ-বিরতি হতে হবে অর্থবহ (বা উদ্দেশ্যমূলক)। এর পরিণতি হবে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে গৃহীত জাতিসংঘের নিজস্ব প্রস্তাব অনুযায়ী মূল সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান। পাকিস্তান একটি প্রস্তাব দেয়।

তিন দফা প্রস্তাব ঃ

(ক) অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি ;

(খ) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে সকল ভারতীয় ও পাকিস্তানী সেনা প্রত্যাহার এবং সেস্থলে আফ্রো-এশীয় দেশগুলো থেকে গৃহীত জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন ; এবং

(গ) তিন মাসের মধ্যে রাজ্যটিতে গণভোট অনুষ্ঠান।

ইতিমধ্যে ভারতীয় নেতারা পুনঃ পুনঃ দাবী করছিলেন যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁরা এমন কোন প্রস্তাব মেনে নিতে পারবেন না যা তাঁদের দাবীর প্রতিকূল। বাহ্যতঃ যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকেও তাঁরা এ কথাই বলেছিলেন।

তাঁর আলোচনার উপর নিরাপত্তা পরিষদে প্রদত্ত রিপোর্টে সেক্রেটারী জেনারেল যে প্রস্তাব করেন তাকে বলা যায় সাবেক বহাল বজায় (**status quo ante bellum**) ঃ তিনি কেবল মাত্র প্রস্তাব করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের উভয়পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া উচিত এবং তাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, তারা যদি এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে তবে তারা জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায়ের ৩৯ ধারায় বর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য বাধ্য থাকে। (এই ধারায় সদস্য দেশগুলো কর্তৃক অর্থনৈতিক অবরোধ এবং কূটনৈতিক ও অন্যান্য রকমের ব্যবস্থা রয়েছে)। মূল সমস্যা সম্পর্কে তিনি কেবল এই প্রস্তাব করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃদ্বয় তাঁদের গ্রহণযোগ্য যে কোন একটি তৃতীয় দেশে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবেন এবং প্রয়োজন হলে নিরাপত্তা পরিষদের একটি কমিটি তাদের সাহায্য করবে।

এর পর যে-সব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তাতে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড এবং জর্দান বিশেষ জোর দিয়ে বলে যে, সমস্যার মূলে হাত না দিলে এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে মূল কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য সুস্পষ্ট ব্যবস্থা না থাকলে কোন যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবই বাস্তবে ফলপ্রসূ হতে পারবে না।

যা হোক, অধিবেশনের অবকাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম আলোচনার পর পরের দিন যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করা হয় তা হলো এই যে, ১৯৬৫

সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বুধবার দিন দুপুরের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এতে দুই দেশের সরকারকে তাঁদের সাবেক অবস্থানে তাঁদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্যও আহ্বান জানানো হয়। এই প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদ অবশ্য এই মর্মেও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, "বর্তমান সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে সাহায্য করার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তাও বিবেচনা করা হবে।"

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ার পূর্বে পাকিস্তানের প্রতিনিধি তাঁর উত্তর প্রদানের অধিকারের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি পাকিস্তানের আন্তরিক আশার প্রতিধ্বনি করে বলেন যে, "কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য পরিষদের দৃঢ় সংকল্প, আশা এবং শক্তি থাকতে হবে।" সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখ না থাকায় সদস্যদের প্রতি প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দানের আবেদন জানিয়ে জনাব এস· এম· জাফর বলেন যে, পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের কাছে যা আশা করে তা হলো এই যে, "স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ইতিপূর্বে কাশ্মীরের জনসাধারণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা দিতে হবে। বর্তমান সংঘর্ষের এই মৌলিক কারণ যদি দূর করা না হয় তবে আরও বৃহত্তর সমরানল সংগঠিত হতে বাধ্য," —তিনি বলেন। নিরাপত্তা পরিষদকে তিনি এও সতর্ক করে দেন যে, "পরিষদ যদি এই বিবাদের সুষ্ঠু সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান না করতে পারেন তবে জাতিসংঘের উপর পাকিস্তানের যে বিশ্বাস রয়েছে তার ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়বে।"

যা হোক উপরতলার রাজনীতি বোধ হয় চান যে, বিবাদটি ১৮ বছর আগে যেখানে ছিল এখনো সেখানেই থাক। প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া

হয় এবং ১০—০ ভোটে পাশ হয়। একজন সদস্য ভোট দানে বিরত থাকেন। ভোট দানে বিরত জর্দানের প্রতিনিধি পরে প্রস্তাবটির উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, "এতে সংগতি ও বাস্তবতার অভাব রয়েছে।" হয়তো বা সাহসের অভাবও।

শান্তির স্বার্থে পাকিস্তান যুদ্ধ-বিরতি মেনে নেয়, তবে কাশ্মীর সমস্যার আশু সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে এই শর্তে।

১৭
অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে

আমরা এ্যাতোক্ষণ যা বললাম, তাকে এক তরফা মনে হতে পারে— মনে হতে পারে, কাশ্মীরের স্বাধীকারকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে ভারতের যতো দোষ নয়, ততো দোষ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা কতিপয় নিরপেক্ষ প্রতিবেদকের দৃষ্টিতে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী তুলে ধরতে পারি।

'টাইম এ্যাণ্ড টাইড' বলছে ঃ

যে কয়েকটি সংবাদপত্র তখনকার কাশ্মীরের মর্মান্তিক ঘটনাবলী চিত্রিত করেছিল 'টাইম এ্যাণ্ড টাইড' তাদের মাঝে অন্যতম। উক্ত পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা দুঃখ করে লিখেছিলেন :

> "রাজনৈতিকরা বলেন যে, কাশ্মীরে যখন শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে তখন গণভোট হবে ; কিন্তু যারা ভোট দেবে তারাই যদি সব মরে যায় বা বাড়ীঘর থেকে বিতাড়িত হয় অথবা ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে যায় ; তখন আর গণভোটের অর্থ কি হবে ?"

নেহেরুর সেনাবাহিনী কাশ্মীর দখলের পর এবং তখন থেকে রাজ্যটির ঘটনাবলীর এটাই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সার।

কিন্তু এই বিভেদাত্মক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের সূত্রপাত হয়েছিলো দেশ বিভাগের বহু আগে। প্রত্যক্ষদর্শীরা তা জানেন এবং তার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করে রাখেন তৎকালীন সচেতন গ্রন্থকার জনাব জিয়াউল

ইসলাম ও অন্যান্যরা। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত উক্ত লেখকের তথ্যবহুল গ্রন্থ 'কাশ্মীর বিপ্লব'-এ যা উল্লেখ করা হয়েছিলো, এখানে তা পুনোরুল্লেখ করা যেতে পারে।

'কাশ্মীর বিপ্লব' থেকে ঃ

উগ্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনী এবং তৎকালীন হিন্দু পাণ্ডাদের বহু আগের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়ে জনাব জিয়া লিখেছেন,

> "দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, স্বাধীনতার বহু আগেই মুজাফ্-ফরাবাদের মুসলমান জনপদগুলো এবং তৎসন্নিহিত গ্রামগুলোতে ডোগরা সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। ১৯৪৭ সালের মে মাসে মুসলমানদেরকে নিরস্ত্র করা হয় এবং যারা তাদের আইন অনুসারে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেননি, ওরা তাদের জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলো। ৪ঠা সেপ্টেম্বরে খবর পাওয়া যায় যে, ডেপুটি কমিশনার গোপনে অমুসলমানদের মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র বিতরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে পুঞ্চ ও আখনুর এলাকার মুসলমানদের নিরস্ত্র করা হয়। সন্দেহ এড়ানোর জন্য প্রথমে অমুসলমানদেরও নিরস্ত্র করা হয়, কিন্তু পরে গোপনে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে যে সমস্ত মুসলমান অফিসার ছিলেন, তাঁদেরকে বেসামরিক প্রশাসন বিভাগে বদলী করা হয় এবং বেসামরিক প্রশাসন বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অনেক মুসলমান অফিসারকে

অপসারণ করা হয়। সকল জেলাতেই ডেপুটি কমিশনার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদগুলো হিন্দু এবং শিখ অফিসার দ্বারা পূরণ করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়—সৈন্য সংখ্যা ৫,৬০০ থেকে ১২,০০০-এ উন্নীত করা হয় এবং এই সব নবাগত সৈনিকদের সবাই হিন্দু। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব গঠিত একটি উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান)-এর নিয়োজিত লোক এবং আর. এস. এস.-এর স্বেচ্ছাসেবী-দের অবাধে সেনাবাহিনী অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। এদের দ্বারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, মুসলিম নারী হরণ, গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে এটা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, তারা কাশ্মীরী মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দেবার জন্য সেই শুরু থেকেই একটি পরি-কল্পনা গ্রহণ করেছিলো।”

এই জঘন্য ও গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে এমন সব প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ রয়েছে যাদের সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাদের মধ্যে বৃটিশের বিশেষ চারজন সংবাদদাতাও রয়েছেন, যাদের কথা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রতিবাদ লিপির উত্তর দানের সময়ে নেহেরুর মতো লোক নিজেও কম করে হলেও এ সত্যকে কিছুটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।

এই পরিচ্ছেদটির প্রথমেই আমরা বলেছি, আমরা নিরপেক্ষ মানুষদের দৃষ্টিতে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ চিত্রটি তুলে ধরবো। ফলে, যে হিন্দুস্থান কাশ্মীরের স্বাধীকারকে নস্যাৎ করেছে, সেই হিন্দুস্থানেরই একটি সংবাদ

আমরা এখানে তুলে ধরছি, যেখানে আর কিছু না পেলেও কাশ্মীরে হিন্দুস্থানী হিন্দু সৈন্যদের আমদানি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব প্রতিবেদনটি জানা যাবে।

'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' বলছে ঃ

তখোনকার 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া'-র মতো একটি হিন্দুজাতির মুখপত্রের সমস্ত সংবাদদাতাগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে,

> “...পরবর্তী পর্যায়ে সেখানে (অর্থাৎ অধিকৃত কাশ্মীরে) আরো এক লক্ষেরও অধিক ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছিলো ... আরো মোতায়েন করা হয়েছিলো স্থানীয় পুলিশ বাহিনী, ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী এবং শান্তি বাহিনীর বিকৃত নামে আরো একটি দল।”

রাজনৈতিক পর্যায়ে 'অন্তর্ভুক্তির' প্রাক্কালেই কাশ্মীরের মহারাজা শেখ আবদুল্লাহ্কে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং তাঁকে জরুরী শাসনের প্রধান পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ব্যাপারটি ছিলো সম্পূর্ণই ষড়যন্ত্রমূলক—যদিও মনে হবে ভালো। কারণ, তারা শেখ আবদুল্লাহর পাশাপাশিই জনৈক মিঃ মেহের চান্দ মহাজনকেও (যিনি সীমা নির্ধারণ কমিশনেও কাজ করেছিলেন) প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হয়। এটা আসলে ছিলো কাশ্মিরী বিপ্লববাদী মুসলিম জনতাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা।

১৯৪৮ সনের মার্চ থেকে শেখ আবদুল্লাহকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেয়া হয়। তার কারণটা খুবই পরিষ্কার—একজন মুসলমান (শেখ আবদুল্লাহ)-কে দিয়ে যতো সহজে হিন্দু স্বার্থ চরিতার্থ করা যায়; একজন হিন্দুকে দিয়ে

তা ততোটা সহজে হাসিল করানো যায় না—বিশেষ করে কাশ্মীরের মতো একটি মুসলমান প্রধান রাজ্যে। তাই যতোদিন শেখ আবদুল্লাহ্ ভারতের এবং মহারাজার 'অন্তর্ভুক্তির' নীতিকে অনুসরণ করে চলিলেন ততোদিন তিনি নিরাপদেই ছিলেন ; কিন্তু যখোনই শেখ আবদুল্লাহ্ ভারতের দেয়া 'গণভোটের প্রতিশ্রুতি'-কে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলেন তখোনই তাঁকে বিভিন্ন দোষে দোষারূপ করে পুনঃ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ভারতের মতো এক চরম স্বার্থবাদী দেশে 'প্রধান মন্ত্রীর' পদ আর 'কারাগার' খুব পার্থক্যের কিছু নয়। এই ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে। শেখ আবদুল্লাহকে বলা হয়েছিলো,

: তুমি ভারতীয় নীতির দিকে পূর্ণভাবে তোমার মতকে পরিবর্তন কর।

শেখ আবদুল্লাহ্ তা করেন নি ; আর তাই তাঁর কপালে এই দুর্ভোগ। শেখ আবদুল্লাহ্ তাঁর জীবনে মাত্র দু'বার স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। একবার, ১৯৫৮ সালে তিন মাসের মতো—অন্যবার আরো অনেক পরে। শেখ আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কাশ্মীরবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়েছিলেন—আর তা চেয়ে তিনি যেনো মহাপাপের কাজই করেছিলেন।

কিন্তু শেখ আবদুল্লাহকে বন্দী করে, আর কোনো হিন্দুকে তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর গদিতে বসালে তো কাশ্মীরের আজাদীর আগুন দ্বিগুণ বেগে জ্বলে উঠবে। তাই ভারত সরকার আগে থেকেই লোক বাছাই করে রেখেছিলো—বক্‌শী গোলাম মোহাম্মদকে। আবদুল্লাহর পরেই তাকে আবদুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। বক্‌শী গোলাম মোহাম্মদের এই 'খোশ নছিব' (!)-এর কারণ হচ্ছে, প্রথমতঃ যে কোনো বিদ্রোহ-দমনে তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত ; দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন কাশ্মীরে গণভোটের

বিরোধী এবং তৃতীয়তঃ বা উপরোক্ত তিনি ছিলেন সরাসরি পাকিস্তান বিরোধী মানুষ। এই তিনটি গুণের কারণে তিনি অত্যন্ত নিরাপদে সুদীর্ঘ দশটি বছর কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীত্বের গদিতে বসে থাকতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এহেনো ভারতীয় ধ্বজাধারী মানুষটিও নিজ পদ থেকে বিদায় নেবার কালে নিজেকে 'নিষ্কলঙ্ক' দেখতে পেলেন না। বক্‌শী গোলাম মোহাম্মদকে যে কারণে নির্গমনে যেতে হয়, তার কারণটিও ভারতীয় পাণ্ডা কামরাজের সৃষ্ট বলে জানা যায়। তার পরিকল্পনা ছিলো, পুরানো রাজনীতিবিদদের স্বেচ্ছায় তরুণদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে হবে। মুলতঃ এটিও ছিলো একটি কারসাজি। কোনো কারণে পুরানো ঝানু রাজনীতি-বিদদেরকে তার গদি থেকে সরাতে হলে, এই নীতির প্রয়োগ করা হতো। এর নাম 'নির্গমন'।

বক্‌শী গোলামকেও নির্গমনে যেতে হয় এবং নির্গমনে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, তাঁকে 'দুর্নীতিবাজ', 'সুবিধাবাদী', 'চোর' ও 'গুণ্ডা' হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কি পরিহাসের বিষয়। বক্‌শীর পর তাঁর মনোনীত মিঃ শামসুদ্দিনকে দিন কয়েকের জন্য কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর গদিতে বসানো হয়। এরপর তাঁকেও সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে ভারতের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অধিকতর বিশ্বস্ত ও কার্যকরী জনৈক মিঃ জি. এম. সাদিককে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

পবিত্র কেশ মোবারকের দুর্ঘটনা ঃ

ভারতের নীতি ও আদর্শ যে কতো হীন তা কাশ্মীরের প্রতি গৃহীত তার প্রতিটি পদক্ষেপই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করবে এবং অধিকৃত কাশ্মীরের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মুসলিম-বিরোধী মনোভাবটা যে কতো ব্যাপক ও গভীর তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর তারা রাখে ১৯৬৩ সালের শেষভাগে পবিত্র

কেশ মোবারক সংক্রান্ত দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে। এই ঘটনা সবার জানা বিধায় তার পুনোরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজনীয়। শুধু এটুকু বলছি, পবিত্র কেশ হারানোর এই ঘটনাটি ছিলো নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য একটি চরম দুঃখজনক ঘটনা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি অন্য রকমটি হতো, তবে কাশ্মীরের মুসলমানগণ আরো অধিক শান্তভাবে তা সহ্য করতে পারতো। এর ফলে অধিকৃত কাশ্মীরে যে অশান্তির প্রাদুর্ভাব হয় এবং যা বিশ্বের কাছে লুকিয়ে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ কিছুই করতে পারেননি, তা ছিলো আসলে বহু বছরের সঞ্চিত চাপা ক্রোধ এবং ঘৃণারই প্রথম মিলিত বহিঃ প্রকাশ।

আশা-আকাঙ্খার প্রদীপটি নিভিয়ে দেয়া হলো !!

প্রথম থেকে না হলেও খুব বেশী পরেও নয়, এটা অনুমিত হচ্ছিলো যে, ভারত রাজ্যটিকে তার নিজের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, বিচার বিভাগীয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে একত্রীভূত করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে অবশ্যই চিন্তা করে থাকবে যে, এতে উক্ত রাজ্যে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা হবে, রাজ্যের জনসাধারণকে পথে আনায় সাহায্য করবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের দাবী যদি কখনো আসে তবে তার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে।

'অন্তর্ভুক্তি' ভারতকে মাত্র তিনটি বিষয়ের উপর ক্ষমতা প্রদান করে— পররাষ্ট্র দফতর, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ। এটা ছিলো ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের অবস্থা। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় গণপরিষদ এই রাজ্যের প্রতিনিধিদের জন্য ৪টি আসন সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরের বছর অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত বিধি প্রয়োগের ব্যাপারে ভারত সরকার এবং ভারত কর্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীরের নেতাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে কয়েকটি স্থূল বিষয়ের উপর মতৈক্য স্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত বিধিসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো :—

(ক) রাজ্য আইন পরিষদ কর্তৃক রাজ্য প্রধান নিযুক্ত হবেন কিন্তু রাজ্য প্রধানকে ভারতীয় প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করতে হবে।

(খ) ভারতের অন্যান্য অংশে ভারতীয় জাতীয় পতাকার যে মর্যাদা রয়েছে কাশ্মীরেও তার ঠিক অনুরূপ মর্যাদা থাকবে।

(গ) মৃত্যুদণ্ড স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা ভারতীয় প্রেসিডেন্টের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

(ঘ) ভারতীয় প্রেসিডেন্টের জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা কাশ্মীরেও প্রসারিত হবে।

১৯৫৪ সালের মে মাসে ভারতীয় প্রেসিডেন্ট এক নির্দেশ জারী করে 'রাজ্য সরকার ও রাজ্য গণ-পরিষদের সম্মতিক্রমে' কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োগ সম্প্রসারিত করেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিধানগুলি কার্যতঃ অধিকৃত কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এখন—

(ক) ছোট খাট ব্যতিক্রমসহ ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ইউনিয়নের অন্যান্য স্থানের মতো কাশ্মীরেও একই অধিকার প্রয়োগ করবে এবং শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যার ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য হবে।

(খ) কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে যে ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে কেন্দ্র এবং কাশ্মীরের মধ্যেও ঠিক সেই ধরনের সম্পর্ক থাকবে এবং রাজ্য কর্তৃক যে শুল্ক কর সংগৃহীত হতো তা উঠে যাবে।

১৯৫১ সালে কাশ্মীরে যে 'গণ-পরিষদ' গঠিত হয় তার বৈধতার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও তা কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যটিকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ঘোষণা করে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। নিভিয়ে দেয় তারা কাশ্মীরের আশা-আকাঙ্খার শেষ প্রদীপ।

ভারতীয় প্রতিনিধি কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদকে প্রকাশ্যভাবে এর উল্টো আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালের জানুয়ারীতে 'শাসনতন্ত্র' গ্রহণের সংগে সংগেই আনুষ্ঠানিকভাবে অধিকৃত কাশ্মীর একীভূত করার উদ্যোগ গৃহীত হয়। ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত রাজ্য পুনর্গঠন পরিকল্পনায় অধিকৃত কাশ্মীরকে উত্তর অঞ্চলের অংশ হিসাবে ধরা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি অঞ্চল (Zone) কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য নিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটিরই নিজস্ব পরিষদ রয়েছে। শীগগীরই পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং কম্পট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল-এর কর্তব্য ও দায়িত্ব একীভূত করার ঘোষণাও প্রচারিত হয়। এর পর ১৯৫৮ সালে ক্রমাগত রাজ্যটিতে ভারতের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিশনের এখতিয়ার সম্প্রসারিত হয়, কাশ্মীর হাই কোর্টকে সদৃশীকরণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় আরও কয়েকটি বিধান। ১৯৬৩ সালে এ-ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ইউনিয়নের অন্যান্য রাজ্যের মতো কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসত গভর্ণর নামে অভিহিত হবেন আর প্রধান মন্ত্রী হবেন মুখ্য মন্ত্রী। ভারত এক অজগর, যে ধীরে ধীরে কাশ্মীর নামক মেষ শাবককে গ্রাস করে ফেললো।

২০

কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে পুরাপুরিভাবে অঙ্গীভূত করে নেবার করুন ইতিহাস

১৯৬৪ সালের শেষ দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ নন্দ রাজ্যটিকে ভারতের সঙ্গে পুরাপুরি সংযুক্ত করে নেওয়ার জন্য যে-সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার একটি তালিকা দেন। তিনি বলেন :

(ক) ১৯৬৪ সালে অধিকৃত কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগের পদ্ধতি ত্বরান্বিত করা হয়। সেখানে যে-সব আইন সম্প্রসারিত করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছে শ্রমিক কল্যাণ, মেডিক্যাল সার্ভিসেস, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, পণ্য বন্টন ও সরবরাহ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এবং আরও কয়েক প্রকার আইন।

(খ) অধিকৃত কাশ্মীরের জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ভারতীয় পার্লামেন্ট একক ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্য পরিষদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করবে।

(গ) সরকার কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে রাজ্যটির শাসনযন্ত্র কখনো বিকল হয়ে পড়লে তথায় প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্তন করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে ভারতীয় পার্লামেন্ট কাশ্মীরের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

১৯৪৭-এর প্রাক্কালে 'ভারত' নামের যে অজগরটি 'কাশ্মীর' নামের যে মেষশাবকের মাথা কামড়ে ধরেছিলো, ১৯৬৪ পর্যন্ত ১৬ বছর সময় নিলো সে সম্পূর্ণভাবে সেই মেষশাবকটিকে গিলে ফেলার জন্য।

ভারতীয় বার্তা প্রতিষ্ঠান, ইউ. এন. আই. সংক্ষেপে এই কথাগুলোর মধ্যে ভারতের এই সংযুক্তির পরিকল্পনা বর্ণনা করেছে :—

> দেশের অবশিষ্ট রাজ্যগুলোর সংগে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে 'ক্রমাগত' ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সমস্ত ধারা প্রয়োগের জন্যে উচ্চতর পর্যায়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
>
> ৩৭০ নং ধারা রহিত করা হচ্ছে না বরং রাজ্যটির উপর পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য তা ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউনিয়নের বিষয়সমূহ এবং কন্‌কারেন্ট লিষ্টসমূহ ধাপে ধাপে রাজ্যটিতে প্রয়োগ করা হবে।

১৯৬৫ : মুছে গেলো সমস্ত নাম নিশানা !

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই সংযুক্তি ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে জাতীয় কনফারেন্সের কার্যকরী সংসদ তাদের দলকে ভারতের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে একত্র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কয়েকদিন পরে কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদও তদানুযায়ী অধিকৃত কাশ্মীরে একটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

এ সব ছাড়াও, কাশ্মীরে ক্রমাগত অধিক সংখ্যক ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্ট নিয়োগের মতো অন্যান্য ব্যবস্থাও অব্যাহত রয়েছে।

ভারত সরকার যে-সব নয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার কয়েকটি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে ১৯৬৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক

টাইমস পত্রিকা তার বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদের শিরোনামা দেয় : "কাশ্মীরের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ভারতের কড়াকড়ি আরোপ।" পত্রিকাটি বরং এটা মৃদুভাবেই উপস্থাপিত করে। গান্ধীর গোপন পরিকল্পনা এমনি করেই ধাপে ধাপে কার্যকরী করা হয়। নেহেরু ও ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ শাস্ত্রী এমনি ভাবেই তাঁর পূর্বসূরীর আরব্ধ কাজ শেষ করেছেন। ভারতীয় পার্লামেন্টে শাস্ত্রী মিঃ নেহেরুর চীৎকারের প্রতিধ্বনি করে বলেন যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁর সরকার তজ্জন্য বাহ্যতঃ যা প্রয়োজন তাই করছেন।

সমসাময়িক ইতিহাসে যদি একটি মাত্র শিক্ষাও থাকে তবে তা হলো এই যে আগেই হোক বা পরেই হোক যে নির্যাতন জনসাধারণকে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে তার মতো বড়ো গণনির্যাতন আর কিছু হতে পারে না। ৮ই আগষ্ট, ১৯৬৫ ছিল কাশ্মীরের গণ-ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ তারিখেই অধিকৃত অংশের অভ্যন্তর থেকে 'সাদা-ই-কাশ্মীর' নামে একটি নয়া বেতার কেন্দ্র (রেডিও ষ্টেশন) বিশ্বের কাছে ভারতীয় শাসকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাশ্মীরী জনসাধারণ কর্তৃক একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠনের কথা প্রচার করে।

তখন থেকে প্রতিদিনই অধিকৃত ভূ-ভাগের সর্বত্র ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তি যোদ্ধাদের নিত্য নূতন সাফল্যের খবর পাওয়া যেতে থাকে।

'সাদা-ই-কাশ্মীর' তার প্রথম প্রচারিত ঘোষণায় বলে : "মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সকল কাশ্মীরবাসীরই তাদের মর্যাদার জন্য সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে উঠা উচিত।" মনে হয় সেরূপই ঘটেছে।

১৯৪৭ সালের দুর্ভাগ্যজনক দিনগুলোর মতো এবারও ভারত এই বলে তার জনসাধারণ তথা বহির্বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে যে, এই অসন্তোষ কোন গণ-অভ্যুত্থান নয় এবং পাকিস্তান কর্তৃক সৃষ্ট অপকীর্তি।

তার 'মপিং-আপ কর্মতৎপরতা'র (সে তাই বলে) ব্যর্থতা দৃষ্টে এবং গণ-অসন্তোষকে একটি নিয়মিত মুক্তি-সংগ্রাম রূপে সমগ্র কাশ্মীরে ছড়িয়ে পড়তে দেখে ভারত সরকার মরিয়া হয়ে সংঘর্ষের দিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই সঙ্গে কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইতিপূর্বে মে মাসে ভারতীয় বাহিনী আজাদ কাশ্মীর অঞ্চলের কার্গিল সেকটরে কয়েকটি ফাঁড়ি দখল করে নেয়। পাকিস্তান জাতিসংঘের নিকট প্রতিবাদ জানায় এবং তার অন্যতম বিরল কার্যকরী হস্তক্ষেপে বিশ্বসংস্থা ভারতকে সেখান থেকে অপসারণে বাধ্য করতে সক্ষম হয়। এবারও ভারত সেই একই পথ বেছে নেয়। সে আবারও সেই ফাঁড়িগুলো দখল করে নেয় এবং তারপর যুরি-পুঞ্চ এলাকার দিকে ধাবিত হয়। পাকিস্তান বাহিনীর সহায়তায় আজাদ কাশ্মীর বাহিনী আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আঘাত হেনে তাদের পিছু হটিয়ে দেয়।

এত প্রবল পাল্টা আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে ভারত তা পূর্বে বুঝতে পারেনি। ভারতীয় দেশরক্ষা মন্ত্রী পরে ভারতীয় পার্লামেন্টে আত্মসমর্পন করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁরা এখন পাকিস্তানের সশস্ত্র শক্তি যাচাই করে দেখতে ও বাইরে বের করে আনতে বাধ্য হচ্ছেন। এটা করার জন্য প্রথমে তারা পাকিস্তানের এক মাইল ভিতরে আওয়ান শরিফ নামে একটি গ্রামে গোলা বর্ষণ করে। অতঃপর তারা পাকিস্তানের লাহোর অঞ্চল আক্রমণ করে। এই যথেষ্ট নয়। ঠিক তার পরবর্তী দিন-গুলোতেই তারা আরও দুটি রণাঙ্গন সৃষ্টি করে—একটি শিয়ালকোট এবং

অপরটি সুদূর দক্ষিণে গাদ্রোতে। ভারত যেমন আশা করেছিল পাকিস্তানের উপর এই পূর্ণাঙ্গ ও বহুমুখী আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যদি ঠিক তেমন ছড়িয়ে পড়ত; তবে তাতেও সুদূর উত্তরে অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর অগ্রগতির তেমন কোন তফাৎ হতো না। মুক্তি যোদ্ধাদের তৎপরতাও কমেনি।

ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যে কয়টি রণাঙ্গন উন্মুক্ত করে তার সব কয়টিতেই তাকে যে রকম বিপর্যয় বরণ করতে হয় সে আর এক কাহিনী।

ভারতের এই ব্যাপক দুঃসাহসিকতার একটি ফল এই হয়েছে যে, জাতিসংঘকে আবার কিছুটা কর্মতৎপর করে তোলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট—১
জাতিসংঘের পাক-ভারত কমিশন (UNCIP)-এর প্রস্তাব

জাতিসংঘের পাক-ভারত কমিশন—(১)

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তান ও ভারতের প্রতিনিধিদের ব্যক্ত মতামতসমূহ সতর্কভাবে বিবেচনা করে কমিশন এই মতে উপনীত হন যে, পরস্পর শত্রুভাবাপন্নতার দ্রুত নিবৃত্তি ও পরিস্থিতির পরিশোধন দরকার। তা না হলে এ সবের ক্রমবর্ধমানতা সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটাবে। পরিস্থিতির চূড়ান্ত মীমাংসা কার্যকরী করার ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকেও এসব যথেষ্ট সাহায্য করবে। এ কারণেই কমিশন ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে একই সময়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :

অংশ—১

[ক] ভারত ও পাকিস্তান সরকার স্বীকার করেন যে, তাঁদের পরস্পরের উচ্চ কর্মকর্তাগণ পৃথক ভাবে এবং এক যোগে যুদ্ধ-বিরতি নির্দেশ প্রদান করবেন এবং এই নির্দেশ থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে তাঁদের সকল সামরিক বাহিনীর উপর ; এবং উভয় সরকার কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর চারদিনের মধ্যে যথাসম্ভব অতি সত্বর তারিখ অথবা তারিখসমূহ উভয় পক্ষকে মিলিতভাবে স্বীকার করে নিতে হবে।

[খ] ভারত ও পাকিস্তান বাহিনীর উচ্চ কর্মকর্তাগণ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে তাঁদের অধীনস্থ বাহিনীর সামরিক ফলপ্রসূ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে নিবৃত থাকার জন্য রাজী থাকবেন।

(এই প্রস্তাবসমূহের আওতাধীন থাকবে উভয় পক্ষের সকল প্রকার বাহিনী ; যেমন প্রস্তুত, অপ্রস্তুত, যুদ্ধে নিয়োজিত, শত্রুতায় রত সকল প্রকারের বাহিনী)।

[গ] ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি বর্তমান অবস্থায় খুব দ্রুত যে কোন প্রয়োজনীয় স্থানীয় পরিবর্তন সাধন করতে পারবেন যা যুদ্ধ-বিরতির পক্ষে উপযোগী হতে পারে।

[ঘ] যদি কমিশন মনে করেন তবে উভয় উচ্চ কর্মকর্তার সহযোগিতা ও নির্দেশক্রমে যুদ্ধ-বিরতি আদেশ প্রত্যক্ষ করার জন্য সামরিক পরিদর্শক নিযুক্ত করা এবং তাঁদের কমিশনের কর্তৃত্বাধীন রাখা এই কমিশনের স্বেচ্ছাধীন থাকবে।

[ঙ] ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকার তাঁদের নিজেদের জনসাধারণের কাছে আবেদন করতে রাজী থাকবেন যাতে তারা আরও অধিক কর্মসাধন করে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

অংশ—২

একই সঙ্গে অংশ ১-এ খসড়াকৃত সত্বর শত্রুতা নিবৃত্তির জন্য গৃহীত প্রস্তাবসহ উভয় সরকার নিম্নলিখিত নীতিসমূহ গ্রহণ করেন। এই নীতির মূলে রয়েছে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি গঠনের কাঠামো। এর পূর্ণ বিবৃতি স্থির করা হবে উভয় সরকারের প্রতিনিধিবর্গ ও কমিশনের আলোচনায়।

[ক]

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদের কাছে বলা হয়েছিল—

১। যেহেতু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য অঞ্চলে পাকিস্তান ফৌজের অবস্থিতি পরিস্থিতির কার্যকরী পরিবর্তন সাধন করে—সেহেতু পাকিস্তান সরকার উক্ত অঞ্চল থেকে সৈন্য অপসারণ করতে রাজী।

২। পাকিস্তান সরকার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে উপজাতীয় লোক এবং পাকিস্তানী জাতি যারা সেখানকার আসল বাসিন্দা নয় এবং যারা সেখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছে তাদের অপসারণ করবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন।

৩। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মুলতবী রেখে পাকিস্তান সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা শাসিত হবে তবে তা কমিশনের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

[খ]

১। যখন কমিশন ভারত সরকারকে অবজ্ঞাত করবেন যে, অংশ—২. ক. ২-এ বর্ণিত উপজাতীয় লোক এবং পাকিস্তানী জাতি অপসারণ করা হয়েছে, অতএব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যা ভারত সরকার নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করেছিলেন এবং যেহেতু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থিতি কার্যকরী পরিবর্তন আনয়ন করে এবং যেহেতু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে পাকিস্তানী বাহিনী অপসারণ করা হচ্ছে সেহেতু ভারত সরকার উক্ত এলাকা থেকে ভারতীয় বাহিনী সরিয়ে আনবার জন্য কমিশনের কাছে রাজী আছেন।

২। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পরিস্থিতির চূড়ান্ত মীমাংসার সকল অবস্থার প্রস্তাব গ্রহণ মুলতবী রেখে, ভারত সরকার যুদ্ধ-বিরতি রেখায় যথাসম্ভব কম বাহিনী মোতায়েন রাখবে এবং এ ব্যাপারেও কমিশনের সঙ্গে সে চুক্তিবদ্ধ থাকবে যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আবশ্যকীয় আইন এবং শৃঙ্খলা অনুযায়ী সাহায্য করবে। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানেই কমিশন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবেন।

৩। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার তাঁর সমস্ত শক্তির প্রয়োগে জনসাধারণকে অবজ্ঞাত করবেন যে, শান্তি, আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে। তাছাড়া মানবিক ও রাজনৈতিক অধিকারও অক্ষুণ্ণ রাখা হবে—এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধানের প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দেবে।

[গ]

১। স্বাক্ষরকৃত সন্ধিচুক্তির সমস্ত বিবরণী অথবা উভয় সরকার ও কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলী সম্বলিত ইস্তাহার সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে।

অংশ—৩

ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভবিষ্যৎ মর্যাদা জনসাধারণের মত অনুযায়ী স্থির করা হবে এবং উভয় সরকার সন্ধি-চুক্তি অনুসারে সুন্দর এবং পক্ষপাতশূন্য অবস্থার জন্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের আশ্বাস দেওয়া হবে।

[আগষ্ট ১৩, ১৯৪৮ তারিখে প্রবর্তিত প্রস্তাব]

জাতিসংঘের পাক-ভারত কমিশন (UNCIP)-(২)

ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের যথাক্রমে ডিসেম্বর ২৩ এবং ডিসেম্বর ২৫, ১৯৪৮ তারিখের যোগাযোগ থেকে প্রাপ্ত তাঁদের গৃহীত

নিম্নলিখিত নিয়মগুলো আগষ্ট ১৩, ১৯৪৮ তারিখের কমিশনের প্রস্তাবের পরিশিষ্ট রূপে পরিগণিত।

১। ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের মারফৎ নির্ধারিত হবে।

২। গণভোট তখনই সম্পাদিত হবে যখন কমিশন প্রত্যক্ষ করবেন যে, আগষ্ট ১৩, ১৯৪৮ তারিখের কমিশন প্রস্তাব অনুযায়ী পরিচ্ছেদ—১ ও ২-এ বর্ণিত যুদ্ধ-বিরতি এবং সন্ধি চুক্তি মেনে নেওয়া হয়েছে এবং গণভোটের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩। (ক) জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কমিশনের সম্মতি গ্রহণ করে একজন গণভোট পরিচালক নিয়োগ করবেন। তিনি বিশ্বাস আনয়নের পক্ষে এক উচু ব্যক্তিত্ব হবেন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীর সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত হবেন।

(খ) গণভোট পরিচালক জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে এমন শক্তি আহরণ করবেন যা তিনি গণভোট গঠন ও পরিচালনা করতে আবশ্যকীয় বলে মনে করেন এবং যা গণভোটের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত।

(গ) যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে গণভোট পরিচালকের ক্ষমতা থাকবে এমন সব কর্মচারী নিযুক্ত করার যারা পর্যবেক্ষকদের সাহায্য করবে।

৪। (ক) আগষ্ট ১৩, ১৯৪৮ সালের কমিশন প্রস্তাবের পরিচ্ছেদ ১ ও ২ কার্যকরী করার পর যখন কমিশন সন্তুষ্ট হবেন যে, রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটেছে—কমিশন এবং গণভোট পরিচালক তখন

ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ভারত ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর চূড়ান্ত অপসারণ ব্যবস্থা স্থির করবেন। এই অপসারণ অবশ্যি রাজ্যের নিরাপত্তা এবং গণভোটের স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হবে।

(খ) আগষ্ট, ১৩ তারিখের প্রস্তাবের পরিচ্ছেদ—২-এর ক (২)-এ উল্লেখিত এলাকার সশস্ত্র বাহিনীর চূড়ান্ত অপসারণ স্থিরিকৃত হবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার পর কমিশন এবং গণভোট পরিচালক কর্তৃক।

৫। রাজ্যের সমস্ত বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যের সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন হবে গণভোটের জন্য তৈরী হওয়ার এবং গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থায় গণভোট পরিচালকের সাহায্য করা।

৬। (ক) রাজ্যের যে সমস্ত নাগরিক গোলযোগের দরুণ রাজ্য ত্যাগ করেছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। তারা ফিরে এসে নাগরিক হিসাবে তাদের সমস্ত অধিকার ভোগ করবে। তাদেরকে জন্মভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সেখানে নিয়োগ করা হবে দুটি কমিশন – একটি গঠিত হবে ভারতের নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা এবং অপরটি পাকিস্তানের নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা। গণভোট পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী এই কমিশন কাজ করবে। ব্যাপারটি কার্যকরী করার জন্য ভারত সরকার, পাকিস্তান সরকার এবং জম্মু-কাশ্মীরের সকল কর্তৃপক্ষ গণভোট পরিচালককে সাহায্য করবেন।

(খ) সমস্ত জনগণ (রাজ্যের নাগরিক ছাড়া) যারা আগষ্ট ১৫, ১৯৪৭ তারিখে কিংবা তারপর থেকে আইনসঙ্গত উদ্দেশ্য ছাড়া এখানে আগমন করছে তাদের রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।

৭। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সকল কর্তৃপক্ষকে গণভোট পরিচালকের সঙ্গে একযোগে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, যে :

(ক) গণভোটে অংশ গ্রহণকারীদের ভয় প্রদর্শণ, বাধ্যকরন, দলন, ঘুষ কিংবা অন্য কোন অসৎ উপায়ে প্রভাবিত করা যাবে না।

(খ) সমস্ত রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক কর্মে কোন বাধা আরোপ করা যাবে না। রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী—জাতি, ধর্ম ও দল নির্বিশেষে সকলের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার এবং ভারত অথবা পাকিস্তানে রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। সংবাদপত্র, ভাষণ এবং জনসভার স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজ্যে ভ্রমণ, আইনগতভাবে প্রবেশ ও বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।

(গ) সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

(ঘ) রাজ্যের সকল অংশের সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) কোন প্রকার দমন থাকবে না।

৮। গণভোট পরিচালক যদি কোন বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন মনে করেন তবে ভারত ও পাকিস্তান সমস্যা সম্পর্কে জাতিসংঘের কমিশনের কাছে বলতে পারেন, এবং কমিশন আপন ক্ষমতা বলে গণভোট পরিচালককে যে-কোন দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানাতে পারেন ; এ সকল দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত রয়েছে।

৯। গণভোটের উপসংহারে বলা যায় গণভোট পরিচালক গণভোটের ফলাফল কমিশন এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের কাছে পেশ করবেন। কমিশন গণভোট অবাধ ও নিরপেক্ষ ভাবে হয়েছে কি হয়নি এটা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন।

১০। সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর অনুযায়ী অগ্রবর্তী প্রস্তাবসমূহের পূর্ণ বিবরণী আগষ্ট ১৩, ১৯৪৮ সালের কমিশনের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছেদ—৩-এর আলোচনায় পূর্ণরূপ পাবে। গণভোট পরিচালক এইসব আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট ;

আগষ্ট ১৩, ১৯৪৮ সালের কমিশন প্রস্তাবে গৃহীত চুক্তি অনুযায়ী ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের জানুয়ারী ১, ১৯৪৯ তারিখের মধ্যরাত্রির ১ মিনিট পূর্ব থেকে যুদ্ধ-বিরতি নির্দেশ কার্যকরী করার নির্দেশ দানের প্রশংসা করেন।

এবং আগষ্ট ১৩, ১৯৪৮ সালের প্রস্তাব ও অগ্রবর্তী নিয়মাবলী দ্বারা আরোপিত দায়িত্বসমূহ প্রতিপালনের জন্য কমিশন উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কাজে ফিরে যেতে মনস্থ করেন।

—১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারী গৃহীত প্রস্তাব

পরিশিষ্ট–২

[১] কাশ্মীর পলিটিক্যাল কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি জনাব গোলাম মহীউদ্দিন কাররার ভাষণ—

[ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ স্বরূপ এই শক্ত চিঠি লেখা হয়েছিল। এই চিঠিতেই সব কিছু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জনাব কাররা ও মওলানা মাসুদী অধিকৃত কাশ্মীরের উচ্চপর্যায়ের নেতাদের মধ্যে রয়েছেন। ভারতীয় দলন নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং কাশ্মীরে ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপনে তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই পরিশিষ্টের দ্বিতীয় অংশে তাঁদের জনসভায় বক্তৃতার ভাষণ পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে। এতে কর্তৃপক্ষের উষ্মার ভাব ব্যক্ত।]

……১১ই মে তারিখে মওলানা মাসুদী এবং আমার উপর যে সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুর আক্রমণ চালানো হয় সে সম্পর্কে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার যে বিবরণী প্রকাশ করেন তার প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরে সরকার এই বিবরণীর ব্যবস্থা করেন এবং এতে নিরূপিত ধারণার উন্মেষ ঘটানো হয় যে, জীপের যাত্রীরা গুরুতর আঘাত পায় এবং পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

এ ব্যাপারে আমার কিছু বলবার ছিল না; কারণ পূর্বপরিকল্পিত এই নিষ্ঠুর আক্রমণে জনসাধারণের অনুভূতি ও রাগ খুব চরম সীমায় পৌঁছেছিল। কিন্তু সরকার সহৃদয়তার পরিবর্তে আঘাতের মধ্যে উপহাস

যোগ করাই বেছে নিয়েছিলেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। এটা খুবই বেদনাদায়ক যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্যবৃন্দ—যাঁদের কাছ থেকে কিছুটা সত্যের আশা করা হয়েছিল, তাঁরা রাজ্য সরকারের বিবৃতি মেনে নিয়েছিলেন। "…এ ধরণের হামলায় জনসাধারণের চোয়াল এবং দাঁত ভাঙ্গেনি অথবা যাত্রীবাহী জীপ ধ্বংস হয়নি।"

প্রায় দশ মিনিট কাল একদল পাঞ্জাবী সশস্ত্র পুলিশ জামিয়া মসজিদের প্রবেশ পথের বাইরে জীপ থামিয়ে রেখেছিল। জীপে ছিলেন মওলানা, আমি নিজে এবং অন্যান্য সঙ্গীরা। মনে হয়েছিল যে, যেন তাঁরা ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল। জায়গাটা ছিল পরিত্যক্ত। খুব তাড়াতাড়ি তারা জীপের যাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের বন্দুকের সঙ্গীণ দিয়ে যাত্রীদেরকে অনবরত বৃষ্টির মত আঘাত হানতে থাকে যেমন আঘাত হানা হয় কাঠসমূহ খণ্ড করার সময়। মওলানাকে বিশেষভাবে এই প্রহারের জন্য আলাদা করা হয়। তিনি ছিলেন ড্রাইভার এবং আমার মাঝখানে। প্রথম আঘাত বর্ষিত হয় তাঁর মুখের উপর এবং এতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। অতঃপর বামপার্শ্বের লোকটি এসে তাঁর ঘাড়ের উপর মারাত্মক দু'টি ঘুষি মারে। তখন ড্রাইভার ও আমি মওলানাকে ঘিরে রাখি। এতে হত্যাকারীরা ভীষণ ক্রোধান্বিত হয় এবং আমরা তাদের রোষের পাত্র হয়ে দাঁড়াই। কি পরিমাণ ঘুষি আমি খেয়েছিলাম তা আজ আমার স্মরণে নেই। কিন্তু মনে আছে একটি আঘাতে আমার পাঁজর ভেঙ্গেছিল এবং অপর আঘাতে ভেঙ্গেছিল আমার দাঁতগুলো। আমার ডান পার্শ্ব যা নাকি আক্রান্ত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল—তা হয়ে গেছিল একেবারে অনুভব শক্তিবিহীন। অন্যান্য

যাত্রীদেরকেও একই সঙ্গে আঘাত হানা হয় এবং তারাও গুরুতররূপে আহত হয়। রাস্তায় কোন লোকজন ছিল না। যারা এই দৃশ্য অবলোকন করছিল তারা ছিল তাদের ঘরে এবং তারা শুধু চীৎকার করছিল ও কাঁদছিল। যখন বাঁচবার আর কোন আশাই ছিল না তখন কাশ্মীর পুলিশের একজন অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আমাদের রক্ষা করেন। একজন পুলিশ গাড়ী চালিয়ে নিল। সারা শহরই ছিল তখন সশস্ত্র পুলিশে ভর্তি এবং উত্তেজনা ছিল চরম সীমায়—এসব এড়াবার জন্য জীপ চালিয়ে প্রধান মন্ত্রীর ভবনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

এটা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য যে, জনসাধারণ ও পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যেও জীপ সেখানে পৌছেছিল। আমরা যেখানে আক্রান্ত হয়েছিলাম নৌহাট্টা চক সেখান থেকে ছিল বেশ দূরবর্তী। সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে মওলানা এবং আমাকে নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে রক্ষাকল্পে নৌহাট্টা চকের দুর্ঘটনার সঙ্গে এই পৃথক ঘটনার যোগসাজস ঘটান। সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিটে সভা শেষ হয় এবং জনসাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে বিদায় নেয়। প্রায় এক ঘন্টা পরে যখন রাস্তায় কদাচিৎ লোক চলাফেরা করে তখনই এই আক্রমণ করা হয়। আমাদের জীপকে অনুসরণ করছিল জনাব মুবারক শাহের গাড়ী এবং তা গেটের কাছে এসে থেমে যায়। তিনি পরিবেষ্টিত জীপে প্রথম আঘাত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজন বন্দুকধারী তাঁর গাড়ী লক্ষ্য করে বন্দুকের গতি স্থির করে। গাড়ীর চালককে গাড়ী পিছিয়ে নিতে আদেশ করা হয় এবং বন্দুকের গুলী গেটের স্তম্ভে প্রতিহত হয়।

তি দৌড়ে নিকটবর্তী টেলিফোনে গমন করেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে ডি আই জি-এর ডি. সি.

ঘটনাস্থলে একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে অতি সত্বর উপস্থিত হন এবং ক্ষিপ্ত পাঞ্জাব পুলিশদের লাইনে নিবদ্ধ করেন।

আমি কৃতজ্ঞ যে, প্রধানমন্ত্রী আমাদের অর্ধমৃত অবস্থা পরিদর্শনে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করলেন এবং আমাদের আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাছাড়া দু'জন আহত লোককে সামরিক হাসপাতালে প্রেরণ করলেন। যদি আমি তিনি হতাম—তা হলে বিবরণীতে আমি এসব ঘটনার উল্লেখ করতাম না; যাতে তিনি যে আমাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন তা খর্ব হয়।

যে-সমস্ত হিতাকাঙ্খী ও সহৃদয় ব্যক্তি মওলানা সাহেবের, আমার এবং আমাদের সঙ্গীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন—আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এ ব্যাপারে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার প্রতিবাদ করবার কিছু নেই কারণ নির্যাতন এবং ত্যাগের দরুণ সেই সব মানুষের মনে ক্ষিপ্ততা এবং বাতুলতা এমন ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে, তারা কাশ্মীরের জনসাধারণের মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং শান্তি অস্বীকার করতে পারে। কাশ্মীরের জনসাধারণ ১৮ বছর ধরে ভীষণভাবে নির্যাতন ভোগ করছে। পুলিশ এবং সৈনিকের হাতে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে। আমার বিশ্বাস কাশ্মীরের জনসাধারণের এই নির্যাতন বৃথা যাবে না। এমন একদিন আসবে যখন তারা তাদের অবদমিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দ্বারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করবে এবং দেশকে গড়ে তুলবে শান্তির আবাসভূমিরূপে।

শ্রীনগর, গোলাম মহীউদ্দিন কাররা

মে ১২, ১৯৬৫। কাশ্মীর রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

[২] মাওলানা মাসূদী ও অন্যান্যদের নিষ্ঠুর আক্রমণের পূর্বে ৯ই মে, ১৯৬৫ তারিখে শ্রীনগর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি।

[সমাগত প্রায় ৪০,০০০ হাজার লোকের এক জনসভায় মওলানা আব্বাস, জনাব জি. এম. কাররা, মৌলভী ফারুক এবং মওলানা মোহাম্মদ সায়ীদ মাসূদী ভাষণ দান করেন]

মৌলভী আব্বাস বলেন যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে সশস্ত্র পুলিশ শান্ত এবং অবিদ্বেষী পরিচালকদের হত্যা করছিল। তিনি জনসাধারণকে উত্তেজিত না হওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে অভিযান চালিয়ে যেতে বলেছিলেন। এবং তারা যে উল্লেখযোগ্য সংঘবদ্ধতা প্রদর্শন করেছিল সে-সবও রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জনাব কাররা সমস্ত উপত্যকা ভূমি, দোদা ও রাজৌরি জেলার অধিবাসীরা যে কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল সেই সব লোকদের দাবী-সমূহ দৃঢ় করার জন্য কর্ম সংগঠনির জবাব দেন। তারা প্রতিবাদস্বরূপ সম্পূর্ণ হরতাল পালন করছিল এবং আইনগতভাবে বিক্ষুব্ধতা প্রকাশ করছিল। জনগণের এরূপ ব্যবহার দর্শনে সশস্ত্র পাঞ্জাব পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় রেল পুলিশ (CRP) ক্রোধোদ্দীপ্ত হয় এবং তাদেরকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কিন্তু জনসাধারণদের তাদের কর্মসূচীকে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ করতে হয়েছিল। যেহেতু উদ্দেশ্যের মূলে ছিল কাশ্মীরের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় এবং পাক-ভারত সমঝোতা বৃদ্ধি হয় এমন উপায়ে কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান, সেই হেতু অধিক উস্কানিমূলক কার্যাকলাপ —নৃশংস হত্যা, মারপিট ও লুট-তরাজ সত্ত্বেও জনসাধারণকে

শান্ত অথচ দৃঢ়সংকল্প বজায় রাখতে হয়েছিল। পুলিশের অত্যাচার থেকে স্কুলের ছেলেমেয়ে, নারী কেহই বাদ পড়েনি। এ সব ছিল কাপুরুষদের কর্ম। প্রশান্ত সাহসিকতাই এ সবের বাধা প্রদান করছিল। জনাব কাররা তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, কোন কোন কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক মনো-ভাব ব্যক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে এবং এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাচ্ছে যাতে অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তিনি দুষ্কর্মকারীদের সাবধান করে দেন। তিনি মুসলমান এবং অমুসলমান সবাইকে গৌরবান্বিত সাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধতা বজায় রাখার অনুরোধ করলেন এবং কাশ্মীরের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, নির্যাতন ও ত্যাগই জনসা-ধারণের সংবদ্ধতা দৃঢ় করেছিল। মানুষের ঐক্যের সূত্র ছিন্ন করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল এবং তাদের ক্রয় করা হয়েছিল মিলিত ইচ্ছাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিতে। কিন্তু মানুষকে বশ করার এই শক্তিও ঘুষ-রূপ চাতুর্য নিষ্ফল হয়। অসমর্থনীয় কার্যকলাপের দরুণ জনসাধারণের নেতা শেখ আবদুল্লাহ্‌কে প্রতিহত করা হয় এবং বিবাদ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের দাবীর ন্যায্যতায় রয়েছে একতা এবং বিশ্বাস; কাজেই জনসাধারণ তাদের সংগ্রামের সুফল নিশ্চয়ই পাবে।

মওলানা ফারুক কাজের সঙ্গে বিশ্বাস যুক্ত করার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। জনসাধারণের দাবী ছিল ন্যায্য এবং যথার্থ। ১৯৩১ সাল থেকেই জনসাধারণদের ভোগ করতে হয়েছে নির্যাতন এবং অসীম ত্যাগ—এসব কোন দিন বৃথা যাবে না। অতঃপর মওলানা সাহেব ভারত সরকারের চাতুর্যপূর্ণ বিভিন্ন ব্যবস্থার ব্যাখা করেন—যে ব্যবস্থা জনসাধারণের কণ্ঠস্বর নিরোধ করতে চেষ্টা করেছিল এবং কাশ্মীর জোর-পূর্বক দখল করার ব্যবস্থা করেছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এখানকার কতিপয় সংবাদপত্র আসল ঘটনা প্রকাশ করেছিল বলে সেই

সব পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের বাণী বুদ্ধিজীবী ও শুভেচ্ছাকর্মীদের কর্ণে পৌছবার জন্যে উচ্চারিত হবেই। কাশ্মীর বর্তমানে কবরগাহ। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকবে না। যত বিলম্বই হোক না কেন জনসাধারণের সংগ্রামের সুফল একদিন ফলবেই। জনসাধারণ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের আশা ত্যাগ করতে পারে না। তাহলে তারা নিপতিত হবে দাসত্ব প্রথার যুগে, স্বৈরাচারীর অতলতায়। ভারত সরকার তার এজেন্টদের সাহায্যে সবাইকে দাসরূপে পরিগণিত করতে প্রয়াস পাচ্ছিল। কিন্তু জনসাধারণের সংগ্রাম হলো তাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। ব্যাপক অর্থে উপমহাদেশের শান্তির সংগ্রাম।

তিনি আরও বলেন যে, পরিদর্শকদের কাছে এ সব দমনের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টা চলছিল যে, দেশে মানুষের জন্য এক দিনেরও শান্তি নেই —সেখানে পরিদর্শকরা আসতে ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তা দেখার ব্যাপার। যে কয়জন পরিদর্শক এসেছিলেন তাঁরাও দৌড়ে চলে গেলেন। জনাব ফারুক অতঃপর মুসলমান ও অমুসলমান সকলের কাছে আবেদন জানালেন যে, অতীতে তারা যেরূপ সংঘবদ্ধতা অবলম্বন করেছে তা পালন করতে এবং তাদের পূর্বপুরুষের জন্মভূমিকে এমন নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মাওলানা মাসুদী শেখ সাহেব ও বেগ সাহেবের কারাবাসের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই বর্তমান পদক্ষেপ জনসাধারণকে তাদের উপযুক্ত নেতার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করছে। তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের কাছে তাঁর আবেদন নিরর্থক হয়েছে। আগাগোড়াই এক মস্তবড় দায়িত্ব পড়েছে জনসাধারণের উপর এবং এ কারণেই তারা তাদের উপযুক্ত নেতার জন্য আইনতগভাবে সংগ্রাম করে আসছিল। তারা কাশ্মীরের সকল সমস্যা সমাধান করতে যথাযথ

ব্যবস্থা করছিল, যাতে জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার সৃষ্টি হয়—যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বের আবির্ভাব ঘটে। মওলানা সাহেব বলেন যে, এটা হলো উত্তম এবং মহান আদর্শ এবং এ জন্যে কাশ্মীর চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এতে প্রয়োজন রয়েছে যথেষ্ট ত্যাগের। সত্যি বলতে কি ৩১ বছর ধরে জনসাধারণ সংগ্রাম করে আসছে। লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। কিন্তু দুর্ভোগ ও ত্যাগ হতে হবে সংঘবদ্ধতা ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অতএব সশস্ত্র পুলিশের সকল দমন, হত্যা, লুট এবং উত্তেজনা মোকাবিলা করতে হবে শান্ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞরূপে। এভাবেই আসবে জ্ঞান ও স্বস্তি। জনসাধারণ নিশ্চয়ই জানে যে, যুদ্ধসংঘটিত হয় সুবিবেচিত ভাবে এবং রাজ্য সরকার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সংঘর্ষের বর্তমান অশুভ মুহূর্ত থেকে লাভ আহরণ করতে চেষ্টা করছে। তারা পরিচালিত হচ্ছে অদূর দৃষ্টিসম্পন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা। কিন্তু কাশ্মীরের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা — যে ভূমিকার নিহিত ছিল সারা উপমহাদেশের স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ— যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ বাস করবে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে।

অতঃপর তিনি মন্তব্য করেন যে সর্বত্রই সশস্ত্র পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা জনসাধারণকে পাখীর মত হত্যা করছিল। সেখানে ছিল না কোন প্রতিরোধ আর ছিল না কোন শাসন। ইচ্ছাকৃতভাবেই এসব করা হয়েছিল। মিঃ নন্দ তাঁর লোকদেরকে এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এইসব লোক তাঁকে বললো যে, শেখ সাহেবকে বন্দী করার পর আমরা দেখবো কি করে জনসাধারণকে চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ করতে হয়। তারা তাদের ক্ষিপ্ত, বর্বর ও অসভ্যজনিত প্রচেষ্টাকে সমর্থিত করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছিল। ন্যায্য চিন্তাবিদদের সকল

নেতারাই লজ্জাবনত হয়েছিল। মিঃ নন্দের লোকেরা এখানে যে কাজ করছিল তার প্রতিবাদে অনেক অমুসলিমই গভীর উষ্মা প্রকাশ করছিল। কিন্তু এসব লোকের প্রধান কর্তব্য ছিল উপমহাদেশের শান্তি ও স্বাধীনতার গৌরব রক্ষার্থে উজ্জল স্বাক্ষর অঙ্কিত করা। এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সকল কাশ্মীরীদেরই ত্যাগ স্বীকারের কষ্ট ভোগ করতে হবে। তখনই জীবন হবে যথার্থ মূল্যবান।

[মিস মৃদুলা সরাবাঈ কর্তৃক প্রচারিত।]

পরিশিষ্ট—৩

[১]

"কাশ্মীরে আমাদের মহান সুযোগ"

—জয়প্রকাশ নারায়ণের ভাষণ—১

[হিন্দুস্থান টাইমস, এপ্রিল ২০, ১৯৬৪ তারিখে প্রকাশিত।]

কাশ্মীরের কাহিনী হলো বিশৃঙখল লক্ষ্য, অনিশ্চিত প্রক্রিয়া এবং অসাধু আদর্শের বিবরণী। গোড়া থেকেই কাশ্মীর ছিল প্রধান মন্ত্রীর বিষয়। তথাপি যখন শেখ আবদুল্লাহ্‌কে প্রধান মন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করে আটক করা হয় তখন ঘটনাক্রমে মিঃ নেহেরু তা অবগত হন—যে রকম অবগত হয়েছিল ভারতীয় অন্যান্য সাধারণ নাগরিক। একটি মাত্র অবিশাস্য ব্যবহারের উদাহরণ এটি এবং এভাবেই তারা কাশ্মীর প্রশ্নের পরিচালনা করছে। শেখ আবদুল্লাহ্‌র মতামতের উপর বর্তমানের অপপ্রচার এই সন্দেহের উদ্রেক করছে যে, পুরনো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি আর আবার ঘটতে যাচ্ছে কিনা?

১১ বছরের অলস কালক্ষেপের পর অবশেষে শেখ আবদুল্লাহ্‌কে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পুনরায় সেখানে বিলম্বিত সিদ্ধান্তের অন্তরালে কোন বিজ্ঞ নীতির নিদর্শন দেখা যাচ্ছে না। শেখ সাহেবের মন্তব্য ব্যক্ত হয়েছে বিস্ময় ও দুঃখ। ভদ্রলোকেরা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বালিতে তাঁদের মাথা আবৃত করে না রাখতেন, তা'হলে তাঁরা এই ভাবাবেগের উলট পালট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারতেন। শেখ আবদুল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা আশা করা হয়নি, এমন কিছুই তিনি বলেননি। সুখের বিষয়, শাসক দলের একটি প্রকৃতস্থ স্বর—যা নাকি প্রধান মন্ত্রীর নিজের কাছ থেকে শোনা গেল।

তা'হলে সর্বোপরি শেখ আবদুল্লাহ্‌র বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার কি ? এটা হল কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ স্থিরিকৃত হবে কাশ্মীরের জনসাধারণ কর্তৃক এবং এমন সুষ্ঠুভাবে গোলযোগ মিটাতে হবে যাতে ভারত ও পাকিস্তান দ্বন্দ্ব বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে অবসান হয়। সামান্য কল্পনাদৃষ্টি দিয়ে দেখলেই এটা সম্ভব যে, ভারতের জন্য কাশ্মীরী নেতার এই স্বচ্ছ এবং নীতিপূর্ণ অবস্থান একটি মহান সুযোগ—যে সুযোগ সবাই ভোগ করতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে তা তোতাপাখীর শ্লোগানের পুনরুক্তি মাত্র এবং তার জন্যে সুস্থ মহল থেকে কোন সাড়াই আসছে না।

এইসব শ্লোগানের একটি হলো এই যে, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত। এটা চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। শেখ সাহেব এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং এটা হল নিরপেক্ষ আইনজীবীদের মীমাংসার বিষয়। কিন্তু আসল কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আইনের পক্ষ সমর্থনের দ্বারা কাশ্মীরের মত কোন মানবীয় সমস্যা সমাধান কোনদিন হতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে, এরূপ একটি সমঝোতাই জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা নিরূপণে প্রধান মন্ত্রীর মূল প্রতিজ্ঞাকে চালিত করেছিল।

এই দিক লক্ষ্য করে আরও দু'টি শ্লোগান উঠেছিল : (ক) কাশ্মীরের জনসাধারণ তিনটি সাধারণ নির্বাচনে ইতিমধ্যেই তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ; (খ) যদি কাশ্মীরের জনসাধারণের ইচ্ছা প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তারা প্রথম থেকে শেষ অবধি ভারতীয় জাতিতে পরিণত হবে।

আমার মতে এ দুটোই ভিত্তিহীন শ্লোগান। শেখ আবদুল্লাহ্‌র গ্রেপ্তারের পর কাশ্মীরের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে এবং স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। যদি সে প্রমাণ খণ্ডন করতে হয় তবে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান

মারফৎ করা যেতে পারে, কিন্তু সরকারী উক্তির মারফৎ নয়। দিল্লী বিশ্বাস করে যে, সে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী যে কোন বিষয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

স্বদেশ প্রেম এবং অন্যান্য গুণাবলীতে আমার অপ্রতুলতা থাকতে পারে ; কিন্তু সব সময়ে এটা আমার কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়েছে যে, কাশ্মীরের জনসাধারণ ভারতের সঙ্গে সংহতি স্থাপনে মনস্থ করেছিল। তারা হয়ত এরূপ করতে পারত ; কিন্তু আজ পর্যন্ত তা করেনি। নির্বাচনের ধরণ ছাড়াও কোন নির্বাচনেই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভবিষ্যৎকে নির্বাচনী বিষয় করা হয়নি। যদি আরও প্রমাণের দরকার পড়ত তাহলে তা শেখ আবদুল্লাহ্‌র জোরদার মতামতে ব্যক্ত হয়েছে—যিনি শেষ পর্যন্ত অন্যান্য কাশ্মীরী নেতার মত জনসাধারণের প্রতিনিধির মত পেশ করেন।

সর্বশেষে, যদি আমরা জনসাধারণের মন্তব্য সম্পর্কে এতই নিশ্চিত, তাহলে কি কারণে তাদেরকে এটার পুনঃরুক্তি করার আর একটি সুযোগ দিতে অস্বীকার করছি ? এর উত্তরে বলা যায় যে, এই নীতি দেশের সংহতি আনয়ন করবে না। এই বিতর্কমূলক আলোচনার মধ্যে আরও কতিপয় হাস্যস্কর কথা বলা হয়েছে। এই যুক্তির পশ্চাতে যে ধারণা রয়েছে তা এই যে, ভারতের রাজ্যসমূহ জোর পূর্বক সংহত রাখা হয়েছে এবং এই সংহতি একই জাতির আবেগ প্রসূত ফল নয়। এই ধারণা ভারতীয় জাতিত্বের উপহাস এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের অত্যাচারের শামিল।

শেখ আবদুল্লাহ্‌কে ভয় দেখানো হয়েছিল যে, যদি তিনি অন্যায় আচরণ করেন তবে আইন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এগার বছরের জন্য আইন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল অথচ সমস্যার কোন সমাধান হয়নি।

ভবিষ্যতে এরূপ চলতে দিলে কোন ফল হবে না। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, অতীতের মুক্তি-যোদ্ধারা কি সহজেই সাম্রাজ্যবাদীদের ভাবা অনুকরণ করতে শুরু করেছিল?

শেষ এবং চূড়ান্ত শ্লোগানে এমন অপপ্রচার ধ্বনিত হয়েছিল যে, কাশ্মীরে আসলে কোন সমস্যাই নেই (?) যদি কোন সমস্যা থাকত তবে তা এতদিন সমাধা হয়েই যেতো। তারা বলে যে, কাশ্মীর ভারতের একটি অংশ এবং তা ঐতিহাসিক সত্য। আমার মতে এটা হলো স্ব-প্রস্তাবনার জঘন্যতম রূপ।

শ্লোগানকারীরা ভুলে যায় যে, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অর্ধেকের কম অংশ পাকিস্তানের অধিকৃত। এটা কি মীমাংসিত সত্য বলে গৃহীত হয়েছে? যদি তা হয়ে থাকে তবে কোথায় এবং কখন? যদি না হয়ে থাকে তবে কিভাবে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হবে— কেবলমাত্র তাদের গোপন চিন্তাপ্রসূত এই ধারণা দ্বারাই যে, "আমাদের যা আছে আমরা রক্ষা করব" এবং "তাদের যা আছে তারা রক্ষা করবে।"

দ্বিতীয়তঃ, সমস্যাটি এখনও নিরাপত্তা পরিষদের কাছে মুলতবী রয়ে গেছে। এবং জাতিসংঘ পরিদর্শক এখনও কাশ্মীরে মোতায়েন রয়েছে। তৃতীয়তঃ, এখানে শেখ আবদুল্লাহ্‌র মত আরও একজন নেতা রয়েছেন যিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন যে, কাশ্মীর সমস্যা এখনও মীমাংসার অপেক্ষায় আছে।

অতএব, এই দেশের একজন অনুগত দাস হিসেবে আমি বিনীত-ভাবে বলছি যে, নিজেদের রচিত বোকার স্বর্গে আশ্রয় গ্রহণ করার চেয়ে আমরা সত্যের মোকাবেলায় সাহস সঞ্চার করে এমন আদর্শ ও নীতি নিয়ে কাজ করি যাতে আমাদের স্বাধীনতার গতিধারা বজায় থাকে। সর্বোপরি, শেখ আবদুল্লাহ্ এমন কিছুই বলেননি যাতে যুক্তি-

পূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার দ্বার রুদ্ধ হয়। তিনি যে-সব কাজ করেছেন তা মূল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই করেছেন এবং রাজ্যের জনসাধারণ যাতে মিলনের স্বীকারুক্তিতে আবদ্ধ থাকে সে সম্পর্কেও নিশ্চয়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি ইংগিত করেছেন যে, জনসাধারণের মনোভাব নিরূপণে কেবলমাত্র গণভোট গ্রহণের পন্থাই গ্রহণযোগ্য নয় এবং তিনি মুক্ত এবং সুন্দর নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। এটা আসল কথা নয় এবং এটা ভারত, পাকিস্তান এবং কাশ্মীরের জনসাধারণের মিলন স্থলের ব্যবস্থা করতে পারে না।

এটা আশার ব্যাপার যে, প্রধান মন্ত্রী বৈদেশিক সমস্যার বিতর্ক-সভায় উত্তর দিতে গিয়ে সাহসের সঙ্গে ইন্দো-পাকিস্তান বন্ধুত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, এমন কি কিছুসংখ্যক শাসনতান্ত্রিক যোগসূত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া উভয় পক্ষের দোষ সম্পর্কে ইংগিত প্রদান করেও তিনি মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ প্রমাণ করেছে যে, ভারত বিভাগের ব্যাপারটিই ছিল মহা ভুল এবং ভারত কোন সমস্যার সমাধান করতেই সমর্থ হয়নি। দুইটি সার্বভৌম জাতিই হচ্ছে এখন অখণ্ডনীয় সত্য।

কিন্তু একই সময়ে আজাদী-উত্তর বছরগুলোর ইতিহাস আর একটি অখণ্ডনীয় সত্য প্রমাণিত করেছে। যেমন, পরস্পরের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা না থাকলে ভারত ও পাকিস্তান কিছুতেই বাঁচতে এবং উন্নতি সাধন করতে পারবে না। তাদের মধ্যে এই ধরণের আত্মীয়তা না থাকলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শক্তির ভারসাম্য উলট-পালট হয়ে যাবে এবং এই উপমহাদেশ ইতিহাস এবং ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে

বঞ্চিত হবে। ফলে সমস্ত ভারসাম্য চীনের পক্ষে ঝুঁকে পড়বে—এটা হবে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি।

কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারটি প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যাপারটি তর্কসাপেক্ষ হতে পারে; কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, গন্তব্যস্থানে পৌছতে অনেক সময় লাগবে এবং আরও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যা স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধুত্বের প্রসার ঘটাতে সমর্থ হবে। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের নেতাদের এমন রাজনৈতিক দৃষ্টি রয়েছে যা এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত দাবী করে।

৩-১-৬৫ তারিখের মিঃ জয়প্রকাশ নারায়ণের ভাষণ-(২)

"এটা বর্ণনাতীত দুঃখের কথা যে, কাশ্মীর সম্পর্কে আবারও সেই দ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়তার পুরানো নীতির অনুধাবন চলছে। কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এক দিকে বলা হয় যে, কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হবে না। অপর দিকে এটাকে করা হবে ইউনিয়নের অন্যান্য রাষ্ট্রের অনুরূপ। আবার একদিকে পুনঃ পুনঃ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে, আমরা নিখুঁত ভাবেই পাকিস্তানের বন্ধুত্ব প্রত্যাশী; অপর দিকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমরা এমন নীতির আশ্রয় নিই যা সকল অস্বাভাবিক সম্পর্ককে আরও জটিল করে তোলে।

আমাদেরকে নিশ্চিত ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে যে প্রশ্নের মোকাবেলা করতে হবে তা হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের শাসনতান্ত্রিক সংহতি, পাকিস্তানের

সঙ্গে বন্ধুত্ব ও শ্রীনগরের জনসাধারণের প্রতি ন্যায় বিচারের চেয়ে জাতীয় সুবিধার খাতিরে বেশি প্রয়োজন কি-না। কাশ্মীরীরা অন্তর্ভুক্তি আইনগত সত্যকে গ্রহণ করেছে বলে কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই। ভাবাবেগ-সংহতির অনুপস্থিতে শাসনতান্ত্রিক সংহতির মূল্য খুবই কম। আজকের যুগে শক্তির বলে কোন জনগণকে চির দিনের জন্য দাবিয়ে রাখা যায় না। যদি আমরা এইরূপ করতে থাকি তবে গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার এবং শান্তির কথা এবং ভাষণের ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। সম্ভবতঃ জোরপূর্বক সংহতি নীতি আনয়ন জঘন্যতম কুফল ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু ঘন্টা বাজাবে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ।

পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রশ্নে আমাদেরকে বিবেচিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সেই বন্ধুত্বের আমাদের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। পরিণত বুদ্ধিতে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, যদি আমরা বর্তমানের নীতিতে অটল থাকি তবে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের কোন বন্ধুত্ব হতে পারে না। দেশের নেতারা এ ব্যাপারে আমাদেরকে কোন সন্দেহের মধ্যে নিপতিত করেননি। যদি আমরা তাদেরকে অবিশ্বাস করি তাহলে কেবল মাত্র আমাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ করতে হবে।

যদি আমরা শাসনতান্ত্রিক সংহতি নীতিতে অটল থাকি তাহলে দেশের প্রতিরক্ষা শতগুণ কিংবা তার চেয়ে বেশি কষ্টকর হবে। এদেশের বিশেষ অংশ যেমন আসাম, নেফা (NEFA) এবং নাগারাজ্য প্রতিরক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস এবং ভূগোল উভয়ই ভারতের উপমহাদেশকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চাবিকাঠির ভূমিকা পালনে নির্ধারিত করেছে।

ভারত ও পাকিস্তান যদি মিলিত ভাবে না চলে, তবে এই অঞ্চলের দেশ-সমূহের জন্য ভারত যা কিছুই করুক না কেন তা মূল্যবান এবং আকর্ষণীয় হবে না। বর্তমানে তারা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে এমন শক্তিশূন্যতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করছে যা আর কেউ নয়; কিন্তু চীনই ভালভাবে পূর্ণ করে দিতে পারে।"

উপসংহার

শেষ রক্ষা হলো না !!

এতোসব দেশীয়, আন্তদেশীয়, উপমহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাদি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতের করাল গ্রাস থেকে বাঁচানো গেলোনা কাশ্মীরকে। তার স্বপ্নসাধের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা গেলো না। মাঝখান থেকে অজস্র মুসলিম নরনারীকে নির্বিচারে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো এক উগ্রপন্থী হিন্দুদের নরমেধজজ্ঞে; যারা এই উপমহাদেশে এক 'রামরাজত্ব' প্রণয়নের দিবাস্বপ্নে আজো বিভোর!

এদের নগ্নরূপ !!

আজ আগ্রাসনবাদীদের নগ্নরূপ উদঘাটনের স্ববিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মুখে মিষ্টি বুলি, বুকে কূট ষড়যন্ত্র জালের বিস্তার, চলনে বলনে কপট ধূর্ততা—সেই 'মুরগী সেবক' শৃগালকে কি আজো আমরা চিনতে ভুল করবো? মওলানা ভাষানী যাদেরকে হাড়ে হাড়ে চিনেছিলেন, মুজিব যাদেরকে চিনেও চুপ করে ছিলেন, এদেশী বর্ষীয়ান সমস্ত জনগণই যাদের নৃশংস নগ্নরূপ ১৯৪৭-এর আগে ও পরে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন; তাদেরকে আজকের নতুন জেনারেশান চিনতে ভুল করে থাকবে; কারণ তাদের নগ্নরূপের ইতিহাস আর কোথাও লিখে

রাখতে দেয়া হয়নি। যখনই আমরা তাদের নগ্নরূপ চিত্রিত করতে চেয়েছি; তখোনই ওরা ওদের এদেশী ছদ্মবেশী এজেন্ট দিয়ে আমাদেরকে 'সাম্প্রদায়িক' ও 'অন্য রাষ্ট্রের দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। এমনকি 'আল বদর' 'রাজাকারের' সিল গয়রহভাবে তাদের পিঠেও মারা হয়েছে। এক্ষেত্রেও তারা সে প্রচেষ্টা ভিন্নভাবে নিতে পারে।

সেই অজগর থেকে সাবধান !!

জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্ভাব্য প্রতিটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে দেখলে—অর্থাৎ কাশ্মীরের ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অবস্থানগত বিচারে (যে সকল বিষয় বিবেচনার ওপর, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের রাজ্যগুলি বিভাগের ভিত্তিমূল রচিত হয়েছিলো, তদানুসারে) নিঃসন্দেহে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পাকিস্তানেরই অন্তর্ভুক্ত।

কাশ্মীর নিজেও তার স্বাধীকার চাইলো; কাশ্মীরের জনগণ এই 'অন্তর্ভুক্তির' ব্যাপারেও স্বীয় আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করতে চাইলো; কিন্তু কোনো কিছুই পারলো না তারা। বৃটিশ ভাইস্রয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন সহ জিন্নাহ, লিয়াকত আলী, আইয়ুব, শেখ আবদুল্লাহ্, মার্কিন আইসেন হাওয়ার, হ্যারিম্যান, বৃটেনের ডানকান, জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা—সব-কিছুকে অগ্রাহ্য করে, হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলিম নর-নারীকে হত্যা করে, ছলে বলে কলে কৌশলে, আগ্রাসনবাদী ভারত কিভাবে মুসলিম-প্রধান কাশ্মীরকে গ্রাস করে নিলো; এ কাহিনী ভারতের প্রতিবেশী হিসেবে, বাংলাদেশকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করেছে।

ভারতের এই আগ্রাসনবাদী শিক্ষা কি এমন একটি বৃহৎশক্তি প্রদত্ত, যারা হাঙ্গেরীর মুক্ত কণ্ঠস্বরকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে—যারা আফ্রিকান মুসলিম রাষ্ট্র ত্রিপোলীতে আজ একটিও যুবক যুবতীকে জীবিত

রাখেনি—যারা আজ মুসলিম প্রধান আফগানকে করতলগত করতে বদ্ধ পরিকর এবং যারা আজ হজম করে নিয়েছে কাজাকস্থান, তাজিকিস্থান, কিরগিজিয়া, উজবেকিস্থান, তুর্কমেনিস্থান, আজারবাইজান, আরমেনিয়া, জর্জিয়া, বাশকীর, বুরিয়াত, দাগেস্থান, কাবার দীনো বলকার, কলমকি, মারী, মরদোভিয়ান, তাতার, উত্তর ওসেতিল, তুভা, উদমুরত, চিচিনো, ইংগুশ, চুভাশ, ইয়াকুত, নাখীচিভান, আবখাজিয়া, আজারিয়ান, কারা-কালপাক, আদাইগেই, গোর্নিআতলাই, কারাচেভোচেরকেস, খাকাস, নাগোর্নিকারাবাক, দক্ষিণ ওসেতিয়ান, গোর্নিবাদাখসান, আগীন বুরিয়াত, চুকোতকা, ইভেংকি, খান্তীমানসী, কোরিয়াক, নেনেটস্, তাইমীর, উস্ত উর্দাবুরিয়াত, ইয়ামালো নেনেটস, ক্রিমিয়া, ভলগা, উত্তর ককেশাস, ভটিয়াক, ইউরাল ও ৪২ লক্ষ বর্গমাইলের সাইবেরিয়ার মতো মুসলিম প্রধান দেশগুলি !!!

নেপাল, ভূটান ও সিমিমের মতো দেশগুলি আজ ভারতের পররাজ্য-লোলুপ কালো থাবার নীচে নিগৃহীত। কাশ্মীরকে তারা কিভাবে গ্রাস করলো, তা বাংলাদেশী নাগরিকদের জানা তাই অত্যন্ত জরুরী। যে অজগরটি একদা কাশ্মীর নামক মেষশাবকের মুণ্ডুটি কামড়ে ধরেছিল ; আজ সেই অজগরের বিষ নিঃশ্বাস লাগছে বাংলাদেশের দেহে। এ দেশের মাঝে ভারতীয় বহু 'নাগশিশুকে' ইতিমধ্যেই প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ভিন্নরূপে, উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় তারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে। এদেশের অনেকে স্বীয় স্বার্থে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গোপনে ভারতের হয়ে কাজ করে চলেছে, সেই নাগশিশু সম্পর্কে আজ অতিশয় সাবধান থাকতে হবে, সেই অজগর সম্পর্কে, যে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে আর যার বিষ নিঃশ্বাস লাগছে আমাদের গায় !!

—সমাপ্ত—